দ্বাদশ গোপাল এবং চৌষট্টি মহান্ত

শ্রী মনোরঞ্জন দে

দ্বাদশ গোপাল এবং চৌষট্টি মহান্ত

দ্বাদশ গোপাল
ও
চৌষট্টি মহান্ত

শ্রী মনোরঞ্জন দে

প্রাপ্তিস্থান

১.	আনন্দ পাবলিশার্স লিঃ ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০	২.	ইস্‌কন, স্বামীবাগ আশ্রম ঢাকা-১১০০
৩.	শ্রী মাধ্ব গৌড়ীয় মঠ নারিন্দা, ঢাকা-১১০০	৪.	ইস্‌কন, ওয়ারী আশ্রম ঢাকা-১২০৩

প্রকাশক ঃ সাবিত্রী রাণী দে।
সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।

দাম ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র।

বিঃ দ্রঃ এ বইয়ের বিক্রিত সমুদয় অর্থ কৃষ্ণ-সেবায় ব্যয় করা হবে। তাই একটি বই ক্রয় করে আপনিও কৃষ্ণ সেবায় অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং অন্যকেও বইটি ক্রয়ে উৎসাহিত করতে পারেন।

লেখকের অপরাপর বইসমূহ

১. বৈষ্ণব সম্প্রদায়।
২. সনাতন ধর্ম ঃ নির্বাচিত প্রবন্ধসমূহ।
৩. কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র।

লেখকের পরবর্তী বই

বৈষ্ণব প্রদীপ (বৈষ্ণব ধর্মের সহস্র প্রশ্নের উত্তর)

উৎসর্গ

পরম পূজ্যপাদ শ্রীল প্রভাবিষ্ণু স্বামী
মহারাজ এর কর-কমলে।

নিবেদন

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীন তারিনম্।

আমি অতি দীন ভক্ত হতে এখনও পারিনি। এ আমার ব্যর্থতা-স্বীকার করি। আবার কোনদিন শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা এই দীন-অভাজনের প্রতি হবে কিনা তাও আমি জানি না।

দ্বাদশ গোপাল এবং বিশেষত চৌষট্টি মহান্ত সম্পর্কে জানার আগ্রহ বহুদিন পূর্ব থেকেই ছিল। অনেক বৈষ্ণবের কাছে মহান্ত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চেয়েছি। কিন্তু কোন সদুত্তর আমি পাইনি। পরবর্তীতে বৈষ্ণব শাস্ত্র সম্পর্কিত কিছু বই পড়ে যা জানতে পেরেছি তা থেকে বুঝতে পারলাম চৌষট্টি মহান্ত সম্পর্কে পূর্বে যে যাই বলেছিলেন তা সবই ছিল ভুল। তখন মনে হয়েছে এ বিষয়ে ক্ষুদ্র হলেও একটা বই সংকলন করা প্রয়োজন যাতে সাধারণ ভক্তগণ এ সম্পর্কে জানতে পারেন। এর ফলশ্রুতিতেই **"দ্বাদশ গোপাল এবং চৌষট্টি মহান্ত"** বইটি লেখা হয়েছে।

এ বই লিখতে যাঁরা কৃপাশীর্বাদ করেছেন তারা হলেনঃ (১) শ্রীপাদ কৃষ্ণ কীর্ত্তন দাস ব্রহ্মচারী (২) শ্রী চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী (৩) শ্রী উজ্জ্বল নীলমণি দাস (৪) শ্রী সুগতিশ্বর দাস (৫) শ্রী পতিত উদ্ধারণ দাস ব্রহ্মচারী (৬) শ্রী অজিতেষ কৃষ্ণ দাস (৭) শ্রী পুষ্পশীলা শ্যামদাস ব্রহ্মচারী (৮) শ্রী দুর্লভ প্রেম দাস (৯) শ্রী মুকুলপদ মিত্র (১০) শ্রী সুলোচন গৌরদাস ব্রহ্মচারী (১১) শ্রী জীবন সাহা (১২) শ্রী লক্ষ্মণ চন্দ্র পোদ্দার (১৩) ডা: শ্রী এন. সি. বোস (১৪) ডা: শ্রী বিমলা প্রসাদ দাস (১৫) শ্রী জ্যোতিশ্বর গৌড় দাস ব্রহ্মচারী এবং (১৬) শ্রী শুভ নিতাই দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ। তাঁদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

ঢাকাস্থ মাধ্ব গৌড়ীয় মঠের শ্রী মধুসূদন মহারাজ, শ্রী পদ্মনাভ মহারাজ এবং শ্রী অজিত কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ এ ব্যাপারে কৃপা করেছেন। সেজন্য তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

বইটি সংকলন করতে গিয়ে যে সব ধর্মীয় পুথি-পুস্তকের সাহায্য নেয়া হয়েছে সেগুলোর মধ্যে **শ্রী শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, শ্রী শ্রী গৌড়-পার্ষদ চরিতাবলী, শ্রী পাট-পর্যটন, শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত, ভক্তি সন্দর্ভ, বৈষ্ণব বন্দনা, ভক্তিরত্নাকর** ইত্যাদি হল প্রধান। এসব বইয়ের রচয়িতা বৈষ্ণব মহাজনদের কাছে আমি বিনম্র চিত্তে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তাঁদের কৃপাশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। এ বিষয়ে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। বইটি ভক্তগণের সামান্য উপকারে আসলেও এই দীন অভাজন কৃতার্থ হবে।

বৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রী মনোরঞ্জন দে।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

দ্বাদশ গোপাল ৭ - ৩৪

দ্বাদশ গোপালের পরিচয় ⇒ ৭

১. শ্রীদাম ⇒ অভিরাম গোপাল ঠাকুর ৮

২. সুবাহু ⇒ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ১১

৩. মহাবল ⇒ কমলাকর পিপ্‌লাই ১৩

৪. লবঙ্গ ⇒ কালাকৃষ্ণ দাস ১৬

৫. সুবল ⇒ গৌরীদাস পণ্ডিত ১৯

৬. বসুদাম ⇒ ধনঞ্জয় পণ্ডিত ২২

৭. অর্জুন ⇒ পরমেশ্বরী দাস (ঠাকুর) ২৩

৮. স্তোক কৃষ্ণ ⇒ পুরুষোত্তম দাস ২৫

৯. মহাবাহু ⇒ মহেশ পণ্ডিত ২৭

১০. মধু মঙ্গল ⇒ শ্রীধর ঠাকুর ২৮

১১. সুদাম ⇒ সুন্দরানন্দ ঠাকুর ৩২

১২. দাম ⇒ পুরুষোত্তম নাগর ৩৩

চৌষট্টি মহান্ত ৩৫ - ৪০

মহান্ত শব্দের অর্থ ⇒ ৩৫

ব্রজলীলার অষ্ট প্রধান এবং চৌষট্টি সখী (মহান্ত)

১. ললিতা সখী ৩৬

২. বিশাখা সখী ৩৬

৩. চম্পকলতা সখী ৩৭

৪. সুচিত্রা সখী ৩৮

৫. তুঙ্গবিদ্যা সখী ৩৮

৬. ইন্দুলেখা সখী ৩৯

৭. রঙ্গদেবী সখী ৩৯
৮. সুদেবী সখী ৪০

শ্রী গৌড়লীলার অষ্ট প্রধান মহান্ত ৪১ - ৫৫

১. ললিতা ⇒ স্বরূপ দামোদর ৪৩
২. বিশাখা ⇒ রায় রামানন্দ ৪৫
৩. সুচিত্রা ⇒ গোবিন্দানন্দ ঠাকুর ৪৮
৪. ইন্দুলেখা ⇒ রামানন্দ বসু ৪৮
৫. চম্পকলতা ⇒ শিবানন্দ সেন ৪৯
৬. রঙ্গদেবী ⇒ গোবিন্দ ঘোষ ৫১
৭. তুঙ্গবিদ্যা ⇒ বক্রেশ্বর পণ্ডিত ৫৩
৮. সুদেবী ⇒ বাসুদেব ঘোষ ৫৫

শ্রী গৌড়লীলার চৌষট্টি মহান্ত ৫৬ - ৭৯

ক. স্বরূপ দামোদরের অনুগত অষ্ট মহান্ত ৫৬
খ. রায় রামানন্দের অনুগত অষ্ট মহান্ত ৬০
গ. গোবিন্দানন্দের অনুগত অষ্ট মহান্ত ৬৪
ঘ. রামানন্দ বসুর অনুগত অষ্ট মহান্ত ৬৭
ঙ. শিবানন্দ সেনের অনুগত অষ্ট মহান্ত ৬৯
চ. গোবিন্দ ঘোষের অনুগত অষ্ট মহান্ত ৭২
ছ. বক্রেশ্বর পণ্ডিতের অনুগত অষ্ট মহান্ত ৭৪
জ. বাসুদেব ঘোষের অনুগত অষ্ট মহান্ত ৭৭

প্রথম অংশ ঃ দ্বাদশ গোপাল

দ্বাদশ গোপালের পরিচয় ব্রজলীলায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহু গোপসখা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১২জন ছিলেন প্রধান। এঁদেরকেই গোপাল বলা হয়। এই দ্বাদশ গোপাল হলেন নিম্নরূপ।

(i) শ্রীদাম (ii) সুবাহু (iii) মহাবল ((iv) লবঙ্গ (v) সুবল (vi) বসুদাম (vii) অর্জুন (viii) দাম (ix) স্তোককৃষ্ণ (x) মহাবাহু (xi) মধুমঙ্গল (xii) সুদাম।

উপরোক্ত দ্বাদশ গোপাল আবার শ্রী গৌড়লীলায় বিভিন্ন নামে আবির্ভূত হন। গৌরগনোদ্দেশ দীপিকা নামক গ্রন্থ অনুযায়ী ব্রজলীলায় যারা দ্বাদশ গোপাল ছিলেন গৌড়লীলায় তাঁরা নিম্নোক্ত নামে প্রকট (অবির্ভূত) হয়েছিলেন।

ব্রজলীলায় নাম	গৌড়লীলায় নাম	শ্রীপাট (বাসস্থান)
১. শ্রী দাম	অভিরাম গোপাল ঠাকুর	খানাকুল কৃষ্ণনগর (হুগলী)।
২. সুবাহু	উদ্ধারন দত্ত ঠাকুর	উদ্ধারনপুর (বর্ধমান)।
৩. মহাবল	কমলাকর পিপ্‌লাই	মাহেশ (হুগলী)।
৪. লবঙ্গ	কালাকৃষ্ণ দাস	আকাই হাট (বর্ধমান)।
৫. সুবল	গৌরীদাস পণ্ডিত	অম্বিকানগর (বর্ধমান)।
৬. বসুদাম	ধনঞ্জয় পণ্ডিত	শীতলগ্রাম (বর্ধমান)
৭. অর্জুন	পরমেশ্বরী দাস	খড়দহ (উত্তর ২৪ পরগনা)।
৮. স্তোককৃষ্ণ	পুরুষোত্তমদাস	সুখসাগর (নদীয়া)।
৯. মহাবাহু (উদার)	মহেশ পণ্ডিত	পালপাড়া (নদীয়া)
১০. মধুমঙ্গল	শ্রীধর(খোলাবেচা) ঠাকুর	মায়াপুর (নদীয়া)।
১১. সুদাম	সুন্দরানন্দ ঠাকুর	হলদা মহেশপুর (যশোর)।
১২. দাম	পুরুষোত্তম নাগর	তেওথা ঝাঁকপাল (ঢাকা)।

(উৎসঃ গৌরগনোদ্দেশ দীপিকা, বহরমপুর সংস্করণ)।

ব্রজলীলার এই দ্বাদশ গোপালের মধ্যে আটজনের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা এখানে তুলে ধরলাম।

১. শ্রীদাম ঃ শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তম প্রিয় সখা। তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের পীঠমর্দ সখাও বলা হয়। শ্যামবর্ণ, পীতাম্বর, রত্নমালা-বিভুষিত, ষোড়শবর্ষ (ষোলবছর) কিশোর। পিতার নাম ⟹ বৃষভানু। মাতার নাম ⟹ কলাবতী (কীর্ত্তিদা)। ভগ্নী হলেন শ্রীমতি রাধা ও অনঙ্গ মঞ্জরী।

২. সুবাহু ঃ যদুবংশীয় ব্রজের পুত্র প্রতিবাহুর ছেলে। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ লীলার অন্যতম প্রধান সখা।

৩. সুবল ঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রধান প্রিয়নর্মবয়স্য সখা (যে সখা বয়সে বড় অথচ বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে অপর বন্ধুর বিভিন্ন কাজে একান্তভাবে সহযোগিতা করে)। তাঁর বয়স সাড়ে বার বছর। গৌরবর্ণ ও নীলবস্ত্র পরিহিত। তাঁর মধ্যে সখীভাব-সমাশ্রিত। তিনি রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলনে সবসময় ত্ত সর্বত্র সহায়ক বলে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ছিলেন।

৪. বসুদাম ঃ শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম প্রিয় সখা। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অপর সখা অর্জুনের বড় ভাই ছিলেন।

৫. অর্জুন ঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম সখা। পিতা⟹সুদক্ষিণ এবং মাতা ⟹ ভদ্রা। তিনি বসুদামের ছোট ভাই ছিলেন।

৬. স্তোক কৃষ্ণ ঃ শ্রীমতি রাধার পিতা বৃষভানু রাজার মহাবসু নামে এক গোপ-বন্ধু ছিলেন। তিনি পুরোহিত ভাগুরির সাহায্যে এক পুত্রেষ্টি যজ্ঞ (পুত্র কামনায় যে যজ্ঞ করা হয়) করেন। ঐ যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন চরু তার স্ত্রী সুচন্দ্রা গ্রহণ করেন। এতে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করে তিনিই স্তোক কৃষ্ণ বলে পরিচিত। এই স্তোক-কৃষ্ণ শ্রী কৃষ্ণের অন্যতম প্রিয়সখা ছিলেন।

৭. মধুমঙ্গল ঃ শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম প্রিয় সখা এবং বিদুষক ছিলেন। ঈষৎ শ্যামবর্ণ, গৌর বর্ণের বস্ত্র পরিহিত এবং বনমালা ভূষিত। পিতার নাম ⟹ সান্দিপনী এবং মাতার নাম ⟹ সুমুখী। ভগিনী নান্দিমুখী এবং পিতামহী পৌর্ণ মাসী।

৮. সুদাম ঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা। বর্ণ-ঈষৎ গৌর, নীলাম্বর বস্ত্র পরিহিত এবং নানা অলঙ্কারে ভূষিত। পিতার নাম ⟹ মটুক এবং মাতার নাম ⟹ রোচনা।

সখা দাম এর পরিবর্তে কেউ কেউ প্রবল সখাকে গোপাল বলে চিহ্নিত করেছেন। গৌরাঙ্গ লীলায় তাঁকে পুরুষোত্তম নাগরের পরিবর্তে হলায়ুধ ঠাকুর বলে নির্দেশ করা হয়েছে। [**দ্রষ্টব্য ঃ শ্রী অমূল্যধন রায় ভট্ট ⟹ দ্বাদশ গোপাল; শ্রী হরিদাস দাস ⟹ শ্রী শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, ৩য় খণ্ড পৃ ঃ ১২৫৮**] এজন্য আমরা এ বইতে হলায়ুধ ঠাকুরের জীবনীও অর্ন্তভুক্ত করেছি।

শ্রীদাম ⟹ শ্রী অভিরাম গোপাল ঠাকুর

ব্রজলীলার দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীকৃষ্ণের সখা শ্রীদাম গৌরাঙ্গ লীলায় শ্রী অভিরাম গোপাল ঠাকুর নামে আবির্ভূত হন। তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শাখার অর্ন্তগত এবং শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর পারিষদ ছিলেন। তিনি অভিরাম গোস্বামী নামেও পরিচিত।

শ্রী অভিরাম গোপাল ঠাকুর শ্রী রামদাস রায় এবং অভিরাম ঠাকুর ইত্যাদি নামেও খ্যাত ছিলেন। শ্রীরাম লীলায় তিনি ভরত ছিলেন। অভিরাম গোপাল ঠাকুর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগর নামক স্থানে বসবাস করতেন। **ভক্তি সন্দর্ভঃ গ্রন্থ** মতে তিনি শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছায় বিবাহ করেন এবং তাঁর পত্নীর নাম শ্রী মালিনী দেবী।

"জীব উদ্ধারিতে অবতীর্ণ বিপ্রবরে।
সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত পরম মনোরম।
নৃত্য-গীতবাদ্যে বিশারদ অনুপম॥
প্রভু নিত্যানন্দ-বলরামের ইচ্ছাতে।
করিল বিবাহ বিজ্ঞ বিপ্রের গৃহেতে॥
শ্রী অভিরামের পত্নী নাম মালিনী।
তাঁহার প্রভাব কত কহিতে না জানি॥
(ভক্তিসন্দর্ভ ঃ ৪/১০৫-১০৮)।

প্রবাদ আছে যে শ্রীকৃষ্ণ লীলার পর ইনি আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। একেবারে শ্রীদাম-সখারূপে ভ্রমণ করছিলেন। পরে নিত্যানন্দ প্রভুর সাথে শ্রী বৃন্দাবনে সাক্ষাৎ হয়। শ্রী বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কর্তৃক রচিত কিন্তু অপ্রকাশিত **"ঐশ্বর্যামৃত কাব্যে"** বর্ণিত রয়েছে যে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু দ্বাপর যুগে ব্রজলীলাকালে পর্বত গুহায় নিলীন-তনু শ্রীদামকে বের করে শ্রী গৌড়লীলার বার্ত্তা বলে নবদ্বীপে আনয়ন করেন।
[দ্রষ্টব্য ঃ শ্রী হরিদাস দাস ঃ শ্রী শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান ৩য় খণ্ড পৃঃ ১১৪৯]

বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রায় সব স্থানেই অভিরাম ও রামদাস-কে অভিন্ন বলে উক্ত আছে। কিন্তু স্বর্গীয় জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় বলেন ঃ " জগদীশ্বর গুপ্ত রামদাসকে অভিরামের নামান্তর উল্লেখ করিয়াছেন; ফলত তাহা নহে। অভিরামলীলামৃত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, শ্রী গৌরাঙ্গদেব এই অভিরাম গোপালকে শ্রীবৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপে আনয়নের জন্য অনুরোধ করিলেন, তিনি তখন মহাপ্রভুর সঙ্গে স্বয়ং আগমন না করিয়া, শক্তি সঞ্চার দ্বারা রামদাস-মূর্ত্তি প্রকাশ পূর্বক নবদ্বীপে প্রভুর সঙ্গে গমন করে নৃত্যকীর্ত্তনে জগৎ মোহিত ও পাষণ্ডদলন করিয়াছিলেন। অভিরামের স্বরূপ রামদাস-শ্রী নিত্যানন্দ শাখা এবং স্বয়ং অভিরাম-শ্রী চৈতন্য শাখা।" **[দ্রষ্টব্য ঃ শ্রী মৃনালকান্তি ঘোষ ঃ গৌরপদ তরঙ্গিনী পৃ ঃ ২১]**

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ থেকে জানা যায় অভিরাম খানাকুল কৃষ্ণনগরে স্বপ্নে আদেশ পেয়ে শ্রী শ্রী গোপীনাথ বিগ্রহকে মাটির ভিতর থেকে উত্তোলন পূর্বক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যে স্থান থেকে তিনি মনোহর শ্রী শ্রী গোপীনাথ বিগ্রহ পান তা রামকুন্ড নামে খ্যাত হয়।

"গোপীনাথ প্রকট কুন্ডের দিব্য জল।
স্নান পানে হৈলা সবে আনন্দ বিহ্বল॥
রামকুণ্ড বাল খ্যাতি হইল তাহার।
লোক গতায়াত যত সীমা নাই তার॥
(শ্রীভক্তি রত্নাকর ৪র্থ তরঙ্গ)।

শ্রী অভিরাম কৃষ্ণভাবনায় অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। একদিন কৃষ্ণ ভাবনায় আবিষ্ট হয়ে সখ্যরসে তাঁর বংশী (বাঁশী) বাজানোর ইচ্ছা হয়। প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে ঠাকুর চারদিকে বাঁশী খুজতে থাকেন। এমন সময় সামনে এক বড় কাঠের খণ্ড দেখতে পেলেন। ষোল জন লোক ঐ কাঠের খণ্ড তুলতে সমর্থ হচ্ছিল না। কিন্তু তিনি সেই কাঠ খণ্ড অনায়াসে তুলে বাঁশী তৈরী করে বাজাতে আরম্ভ করেন। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় এ সম্বন্ধে বলা আছে ঃ

"রামদাস মুখ্য-শাখা সখ্য প্রেমরাশি।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ যে তুলি কৈল বাঁশী॥"
[চৈ.চ. আদি ১১/১৬]

শ্রী অভিরাম ঠাকুর সম্পর্কে শুনা যায় তিনি এমন তেজস্বী ছিলেন যে শ্রী বিগ্রহ ও শালগ্রামকে প্রণাম করলে তা ফেটে যেত। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর সাতজন পুত্রকে প্রণাম করে ইনি নষ্ট করেছিলেন। পরে শ্রী বীরভদ্র গোস্বামী জন্ম গ্রহণ করলে অভিরামের প্রণাম তিনি (বীরভদ্র) সহ্য করেন। তখন অভিরাম আনন্দে তাঁকে (বীরভদ্রকে) শ্রী গৌরাঙ্গের দ্বিতীয় কলেবর বলে স্বীকার করেন। একথা শ্রী অভিরাম গোপাল নিজের রচিত **শ্রী বীরভদ্রাষ্টকে** স্বীকার করেছেন ঃ **সোয়ং প্রসীদতু হরিঃ কিল বীরভদ্রঃ।'** শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা শ্রী গঙ্গামাতা সম্পর্কেও একই কথা। শ্রী অভিরাম তাঁর রচিত **"শ্রী গঙ্গাস্তোত্রে"** বলেছেন ঃ 'প্রভুর অনুচর শ্রীদাম সখা আমি সেই বস্তু কোথায় আছেন জানিবার জন্য পৃথিবী পর্যটন করিতেছি। কিন্তু হে মাতঃ গঙ্গে! তোমাকে দ্বাদশবার প্রণাম করিয়াও যখন দেখিলাম যে তুমি অক্ষত দেহে হাস্য করিতেছ তখনই তোমার অসাধারণ ঐশ্বর্য অবগত হইয়াছি।' **[দ্রষ্টব্য ঃ শ্রী হরিদাস দাস, শ্রী শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান পৃঃ ১১৪৯]**

শ্রী অভিরাম ঠাকুরের একটি প্রসিদ্ধ চাবুক ছিল। তার নাম ছিল জয় মঙ্গল। যাকে তিনি এই চাবুক দ্বারা প্রহার করতেন সেই ভাগ্যবান হতো। সেই কৃষ্ণ প্রেমধন লাভ করতেন। শ্রী নিবাস আচার্যকেও এই চাবুকের আঘাত একসময় খেতে হয়েছিল। এই কাহিনী এরূপ ঃ একদিন শ্রী নিবাস আচার্য শ্রী অভিরাম ঠাকুরকে দর্শন করতে আসেন। তখন তাঁর অঙ্গে অভিরাম তিনবার চাবুক দ্বারা মৃদু আঘাত করেন। এই দেখে অভিরামের স্ত্রী মালিনীদেবী বলেন, ঠাকুর! আর মেরোনা, শান্ত হও। শ্রী নিবাস বালক, তোমার চাবুকের আঘাতে সে অধীর হয়ে পড়বে। কিন্তু এই চাবুকের মৃদু আঘাতেই শ্রী নিবাসের কৃষ্ণ প্রেম উদয় হয়।

শ্রী অভিরাম গোপাল ঠাকুর অত্যন্ত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁকে দেখে পাষণ্ডগণ কম্পমান হতো। জয়মঙ্গল চাবুক দ্বারা আঘাত করে তিনি বহু পাষণ্ডকে উদ্ধার করেছিলেন।

"অভিরাম গোস্বামীর প্রতাপ প্রচন্ড।
যারে দেখি কাঁপে সদা দুর্জ্জয় পাযণ্ড॥"

হুগলী জেলার অর্ন্তগত কৃষ্ণনগর আমতা এবং বাঁকুড়া জেলার অর্ন্তগত বিষ্ণুপুর, কোতলপুর ইত্যাদি স্থানে শ্রী অভিরাম ঠাকুরের শিষ্যবর্গের বংশধরগণ বসবাস করেন। খানাকুল কৃষ্ণনগরে শ্রী অভিরাম ঠাকুরের সেবিত শ্রী শ্রী গোপীনাথ জীউ বিরাজ করছেন। তিনি চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথিতে অপ্রকট হন।

সুবাহু ⟹ শ্রী উদ্ধারন দত্ত ঠাকুর

ব্রজলীলায় (শ্রীকৃষ্ণ লীলায়) যিনি সুবাহু গোপাল নামে বিরাজ করেছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় তিনি শ্রী উদ্ধারন দত্ত ঠাকুর নামে অবির্ভূত হন। **সুবাহুর্যো ব্রজে গোপো দত্ত উদ্ধারনাখ্যক ঃ" (গৌরগনোদ্দেশ দীপিকা)।**

উদ্ধারন দত্ত ঠাকুর শ্রী নিত্যানন্দ শাখার অর্ন্তগত ছিলেন। এর প্রমাণ শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত এবং শ্রী চৈতন্য ভাগবতে পাওয়া যায়।

"মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারন।
সর্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥"

(চৈ. চ. আদি ১১/৪১)।

"জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ স্বরূপ ঈশ্বর।
জন্ম জন্ম উদ্ধারন তাঁহার কিঙ্কর॥"

(চৈ.ঃ ভাগবত অন্ত্য ৫/৪৫২)।

১৪০৩ শকাব্দে সমৃদ্ধশালী সপ্তগ্রাম নগরীতে ধনী সুবর্ণ বনিক বংশে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম - শ্রী কর দত্ত, মাতার নাম - শ্রীমতি ভদ্রাবতী, পুত্রের নাম- শ্রী নিবাস।

৯৭৫ শকাব্দে উদ্ধারন দত্তের পূর্বপুরুষ শ্রী ভবেশ দত্ত অযোধ্যা থেকে সুবর্ণ গ্রামে (সপ্তগ্রাম) বানিজ্য করতে আগমন করেন। সেখানে শ্রী কাঞ্জিলাল ধরের বোন শ্রী মতি ভাগ্যবতীকে বিবাহ করেন। কাঞ্জিলাল ধরের পুত্রের নাম উমাপতি ধর। ইনি মহারাজ লক্ষ্মনসেনের সভায় কবি জয়দেব ও পণ্ডিত গোবর্ধন আচার্যের সাথে থাকতেন। শ্রী ভবেশ দত্তের পুত্র কৃষ্ণ দত্ত তৎকালীন সময়ে পণ্ডিত ছিলেন। তার পুত্রই শ্রীকর দত্ত।

শ্রী উদ্ধারন দত্ত কাটোয়ার দেড়-ক্রোশ-দূরে নবহট্ট বা নৈহাটীর নৈরাজা নামক জনৈক রাজার দেওয়ান ছিলেন। তৎকালীন সময়ে উদ্ধারন দত্ত ঠাকুর উক্ত স্থানের

উত্তরে উদ্ধারনপুর গ্রামে বাস করতেন। কথিত আছে তাঁর নামানুসারেই উদ্ধারনপুর গ্রামের নাম হয়।
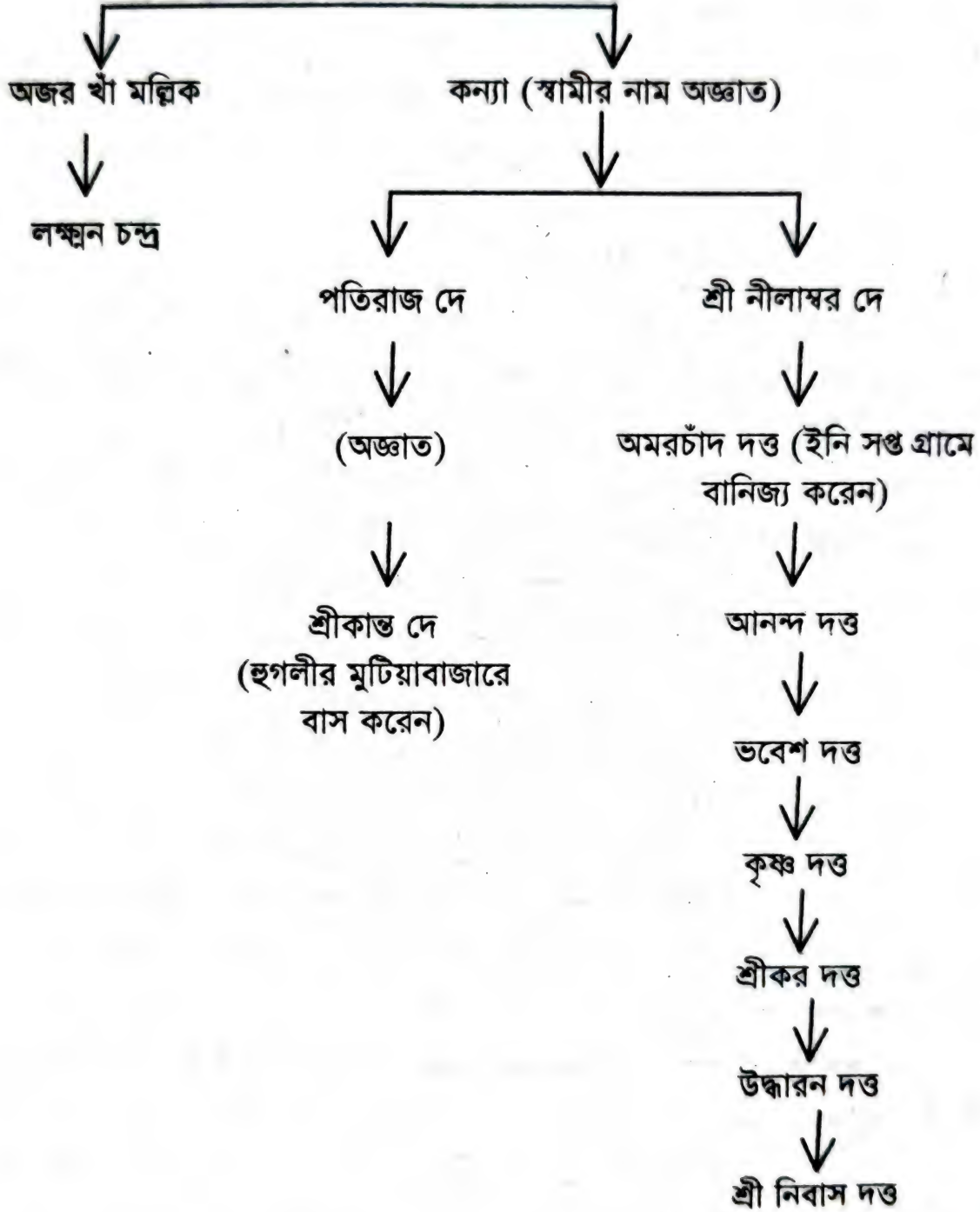
তিনি শেষ বয়সে সপ্তগ্রামের বাসস্থান ত্যাগ করে এ স্থানেই বসবাস করেছিলেন। উদ্ধারনপুরে আজও তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রী শ্রী নিতাই গৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজ করছেন। এই মন্দিরের পশ্চিমে শ্রী দত্ত ঠাকুরের সমাধি রয়েছে।

উদ্ধারন দত্ত ঠাকুর শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর পারিষদ ছিলেন। বিপুল ঐশ্বর্য এবং পুত্র-পরিবার ত্যাগ করে তিনি শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর সাথে ভ্রমণ করে বেড়াতেন। তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর কিঙ্কর (অনুগত) হয়ে তাঁর সাথে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে বেড়াতেন। উদ্ধারন দত্ত ঠাকুর নিত্যানন্দ প্রভুর এত প্রিয়পাত্র ছিলেন যে একদিন সূর্যদাস পণ্ডিতের গৃহে ব্রাহ্মন পণ্ডিতগণ/ভট্টাচার্যগণ শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞেস করেন ঃ "শ্রীপাদ! আপনার রন্ধন কে করেন?" উত্তরে তখন প্রভু বলেছিলেন ঃ "কখন আমি করি; না পারিলে উদ্ধারন রন্ধন করে।"

উদ্ধারনপুরের গঙ্গাতীরে যে পাকা ঘাট আছে তা দত্ত ঠাকুরের নির্মিত বলে প্রবাদ রয়েছে। পূর্বোক্ত নৈহাটীর নৈরাজার দালান কোঠার চিহ্ন বর্তমানের পাতাই হাট গ্রামে বিরাজমান।

উদ্ধারন দত্ত ঠাকুরের জন্মভমি সপ্তগ্রামে একটি প্রাচীন মাধবী লতার গাছ দেখতে পাওয়া যায়। প্রবাদ এই যে- শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু এই গাছটি নিজের হাতে রোপন করেছিলেন। হুগলি জেলার বালী নিবাসি শ্রী জগমোহন দত্তের দেবমন্দিরে প্রাচীনকালের খোদিত শ্রীদত্ত ঠাকুরের একটি প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়। প্রতিদিন এই মূর্ত্তির পুজা হয়। উদ্ধারন দত্ত ঠাকুরের সেবিত শ্রী শালগ্রাম শিলা উক্ত স্থানের শ্রী নাথ দত্তের গৃহে সেবা করা হচ্ছে।

সপ্তগ্রামে উদ্ধারন দত্ত ঠাকুরের নিজের হাতে সেবিত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ষড়ভুজ মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তির দক্ষিণে শ্রী নিত্যানন্দ এবং বামে শ্রী গদাধর বিরাজমান। অন্য সিংহাসনে শ্রী রাধা-গোবিন্দ ও নীচে উদ্ধারন দত্ত ঠাকুরের চিত্রপট (ছবি)। শ্রী নিত্যানন্দ-শক্তি জাহ্নবা মাতা সপ্তগ্রামে উদ্ধারন দত্ত ঠাকুরের গৃহে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন আসেন তখন দত্ত ঠাকুর জীবিত ছিলেন না।

ষাট বছর বয়সে ১৪৬৩ শকাব্দের অগ্রহায়ন মাসের (মতান্তরে পৌষ মাসের) কৃষ্ণ পক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে উদ্ধারন দত্ত ঠাকুর অপ্রকট হন (তিরোধান করেন)। তাঁর বংশধরগণ হুগলী, কোলকাতা ইত্যাদি অনেক স্থানে ব্যপ্ত হয়ে বর্তমানে বসবাস করছেন।

মহাবল ⇒ কমলাকর পিপ্‌লাই

ব্রজলীলার দ্বাদশ গোপালের অন্যতম মহাবল গোপাল গৌড়লীলায় কমলাকর পিপ্‌লাই নামে অবির্ভূত হন। শ্রী চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে ইনি কমলাকান্ত পিপ্‌লাই নামে অভিহিত। তিনি শ্রী নিত্যানন্দ শাখার অর্ন্তগত এবং প্রভুর পার্ষদ ছিলেন। **"বৈষ্ণবাচার দর্পণে"** লিখিত আছে ঃ

'মহাবল গোপাল যে ছিল বৃন্দাবনে।
কমলাকর পিপ্‌লাই সেই সে এখানে॥
দিবারাত্র করে রাধাকৃষ্ণ গুন গান।
নিত্যানন্দ প্রভু শাখা বৈষ্ণবের প্রান॥

শ্রী কমলাকর পিপ্‌লাই -এর জন্মস্থান সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ আছে। শ্রী পাট-পর্যটন নামক এক গ্রন্থ থেকে দেখা যায় তিনি আকনা-মাহেশ নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন এবং জাগেশ্বরে বসবাস করতেন।

"আক্‌না মাহেশে জন্ম জাগেশ্বরে স্থিত।
কমলাকর পিপ্‌লাই এই যে লিখিত॥
কমলাকর মহাবল পূর্বনাম হয়॥
(শ্রী পাট পর্যটন)।

কিন্তু কমলাকর পিপ্‌লাই মহাশয়ের অধস্তন ১৪তম পুরুষ মাহেশ নিবাসী শ্রী শ্রী জগন্নাথদেবের সেবক শ্রী প্রসাদ দাস অধিকারী মহাশয় তাঁদের বংশ পরম্পরা ধারায় শোনা কাহিনী এবং দেবালয়ে রক্ষিত পুরাতন কাগজপত্র থেকে নিন্মোক্ত বিষয় সমূহ জানান ঃ

সুন্দরবনের নিকট খালিজুলি নামক গ্রামে ১৪১৪ শকাব্দে বাংলা ৮৯৯ সালে কমলাকরের জন্ম হয়। তিনি শুদ্ধ শোত্রীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং বাৎস্য গোত্রের অর্ন্তভুক্ত। তাঁর পিতা ধনী জমিদার ছিলেন। কমলাকরের কনিষ্ঠ ভাইয়ের নাম নিধিপতি।

বৈষ্ণবাচার দর্পণ অনুযায়ী কমলাকর পিপ্‌লাই হুগলী জেলার শ্রীরামপুর থেকে এক ক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গার তীরবর্তী মাহেশ নামক স্থানে শ্রী শ্রী জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর বংশীয় অধিকারী মহাশয়গন বলেন যে ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী নামক জনৈক ভক্ত উক্ত শ্রী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে কমলাকরকে তার সেবার ভার দিয়ে যান। কমলাকর স্বপ্নে আদেশ পেয়ে মাহেশে এসে শ্রী শ্রী জগন্নাথদেবের সেবার ভার গ্রহণ করেন। তিনি নিজের জন্মস্থান খালিজুলী থেকে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন এবং কুল-পুরোহিত চন্ডীবর ঠাকুরকে মাহেশে নিয়ে এসে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। মাহেশ পূর্বে বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর আগমনে সেটি সুন্দর গ্রামে পরিণত হয়।

কমলাকর পিপ্‌লাই মহাশয় বিবাহ করে সংসারী হন। তাঁর এক কন্যারত্ন ছিল- তাঁর নাম বিদ্যুৎমালা দেবী। **"শ্রী নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার"** নামক এক গ্রন্থ থেকে জানা যায় পিপ্‌লাই মহাশয়ের কন্যার সাথে মাহেশ নিবাসী শ্রী সুধাময় চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। কন্যা ও জামাতা শ্রী পুরীধামে গমন করেন। সেখানে তাঁদের এক কন্যা সন্তান হয়- তাঁর নাম নারায়নী দেবী। এঁর সাথে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রী বীরভদ্র-এর বিবাহ হয়।

"মাহেশ নিবাসী এক বিপ্র শুদ্ধ চিত্ত।
বিষ্ণু-বৈষ্ণব পুজা তাঁর নিত্যকৃত্য॥
সুধাময় নাম পিপ্‌লায়ের জামাতা।

বিদ্যুন্মালা নাম হয় তাহার বনিতা॥
(শ্রী নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার ৩য় স্তবক পৃঃ ১৬)।

কিন্তু উপরোক্ত বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। বৈষ্ণবাচার দর্পণ গ্রন্থ অনুসারে পিপ্‌লাই মহাশয়ের জামাতা ⇒ যদুনন্দন।

'শ্রী যদুনন্দন, শুদ্ধচিত্ত হন, নানাবিধ গুনালয়।
ভার্যা বিদ্যুন্মালা, লক্ষীসম লীলা, পিতা যার পিপ্‌লাই।
মাহেশে নিবাস, জগন্নাথে আশ অন্য আশ কিছুই নাই।
শ্রী কমলাকর, যাহার শ্বশুড়, জামাতা যদুনন্দন॥
(বৈষ্ণবাচার দর্পন, পৃঃ ১০)।

তবে মাহেশের কমলাকর বংশীয় অধিকারীগণ বলেন যে কমলাকরের কন্যার নাম ⇒ রাধারানী এবং তাঁর ভাইয়ের মেয়ের নাম ⇒ রমাদেবী। দুই ভাইয়ের এই দুই কন্যাকে খড়দহের প্রসিদ্ধ কামদেব পন্ডিত এবং যোগেশ্বর পণ্ডিত বিবাহ করেছিলেন। কমলাকর পিপলাইর ছেলের নাম চতুর্ভূজ ছিল। তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ।
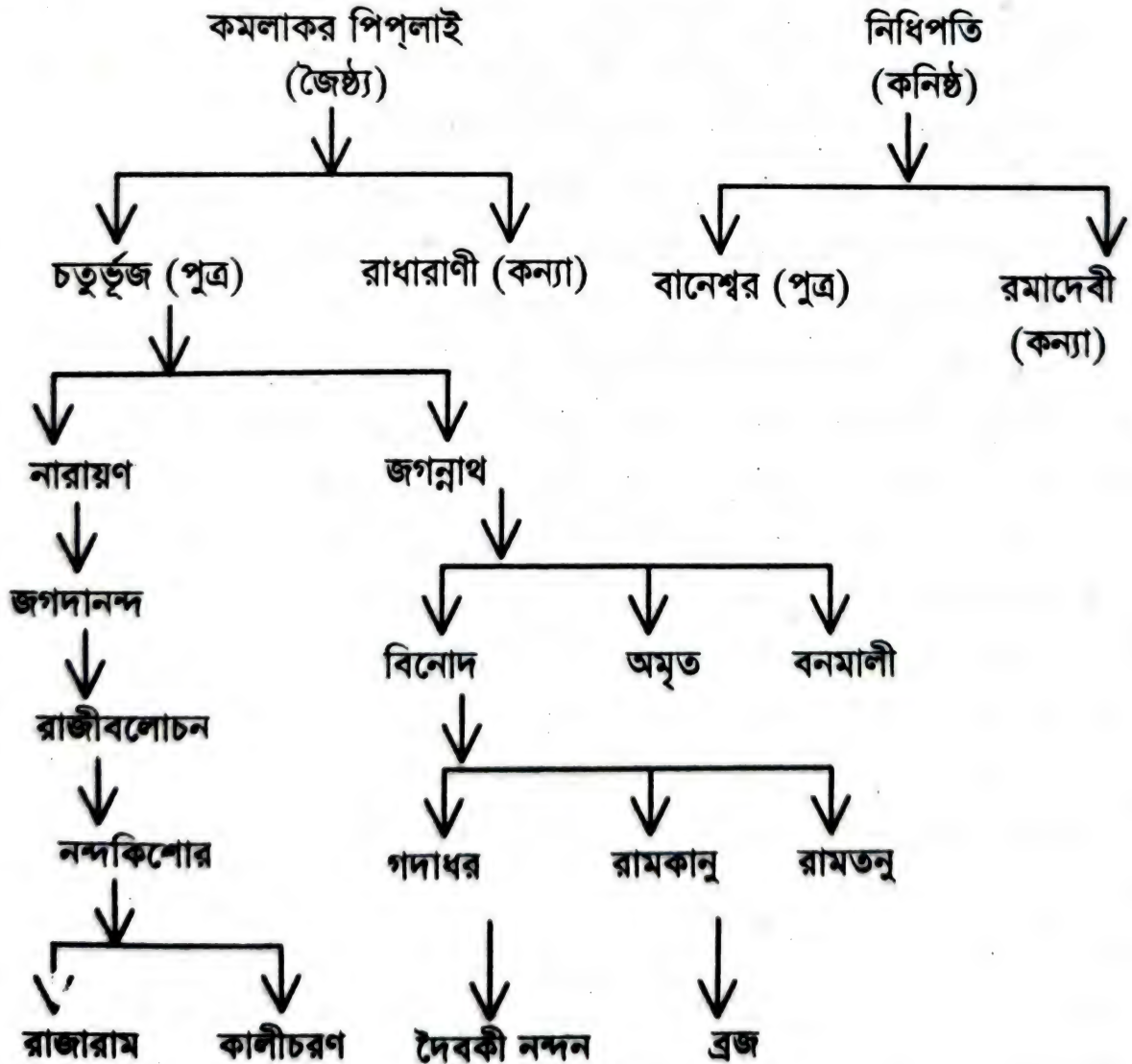
(উৎস ঃ শ্রী হরিদাস দাস ঃ শ্রী শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৬১)।

কথিত আছে কমলাকর পিপ্‌লাই ১৪৩৯ শকাব্দে পানিহাটীর দধি-চিড়া মহোৎসবে এবং ১৫০৪ শকাব্দে খেতুরের বিখ্যাত উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। কাটোয়ার দাস গদাধরের তিরোভাব উৎসবেও তিনি ছিলেন। কমলাকরের বংশধর রাজীবলোচনের সময় (বাংলা ১০৬০ সালে) শ্রী জগন্নাথদেবের সেবার খুব দুরবস্থা হয়। তবে ঐ সময় কোন কারণে ঢাকার নবাব শ্রী জগন্নাথদেবের নামে ১১৮৫ বিঘা জমি দান করেন। শ্রী জগন্নাথদেবের নাম অনুসারে উক্ত মৌজার নাম জগন্নাথপুর হয়। এটি মাহেশ থেকে দেড় ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। কিছু দিন পর উক্ত মৌজার কর নিয়ে গোলমাল হলে নবাব সাহেবের দেওয়ান পানিহাটী নিবাসী শ্রী গৌরচরণ রায় চৌধুরী চুনাখালী পরগনার উপর জগন্নাথপুরের করভার অর্পন করে একে দেবোত্তর করে দেন।

শ্রী কমলাকার পিপ্‌লাই যেখানে বসবাস করতেন সেই মাহেশে শ্রী শ্রী জগন্নাথদেবের পুরাতন মন্দির একসময় গঙ্গার ভাঙ্গনে নষ্ট হয়ে গেলে কোলকাতার পাথুরিয়াঘাট নিবাসী স্বর্গীয় নয়নচাঁদ মল্লিক ১১৬২ সালে নূতন করে সেটি নির্মান করে দেন। ঐ স্থানে বর্তমানে শ্রী শ্রী জগন্নাথদেবের একটি অতি সুন্দর রথ আছে। ১২৯২ সালে পুরাতন কাঠের রথটি ভস্মীভূত হলে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র নামে জনৈক ধনী ব্যক্তি ২০ হাজার মুদ্রাব্যয়ে একটি লোহার রথ নির্মাণ করে দেন।

উল্লেখ্য যে সর্ব প্রথম কোলকাতার শ্যামবাজার নিবাসী দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসু এখানে একটি কাঠের রথ তৈরী করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে সেটি জীর্ণ হলে তার ছেলে দেওয়ান গুরুচরণ বসু সেটি পুনরায় নির্মাণ করে দেন। কিন্তু ১২৬০ সালে ঐ রথ ভস্মীভূত হয়। এরপর গুরুচরণ বসুর পুত্র কাঁলাচাদ বসু পুনরায় রথ নির্মান করেন। এরপর প্রথমোক্ত লৌহনির্মিত রথ আজ পর্যন্ত চলে আসছে। শ্রী জগন্নাথ দেবের গুঞ্জাবাটী ১২৬৪ সালে মল্লিক বংশীয়া জনৈক রঙ্গময়ী দাসী কর্তৃক নির্মিত হয়। পিপ্‌লাই মহাশয়ের বংশধরগণ বর্তমানে অধিকারী নামে খ্যাত।

বৈষ্ণবাচার দর্পণ গ্রন্থ অনুযায়ী কমলাকর পিপ্‌লাই কন্যার বিবাহ দিয়ে শ্রী বৃন্দাবনে গমন করেন এবং সেখানেই দেহরক্ষা করেন। কিন্তু তাঁর বংশীয় লোকজনের মতে ১৪৮৫ শকাব্দে বা বাংলা ৯৭০ সালে ৭১ বছর বয়সে চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে তিনি দেহরক্ষা করেছিলেন। পিপ্‌লাই মহাশয়ের কোন সমাধি মাহেশে নেই। এজন্য শ্রীবৃন্দাবনে তার দেহরক্ষা হতে পারে।

লবঙ্গ ⟹ কালাকৃষ্ণ দাস

ব্রজলীলায় দ্বাদশ গোপালের অন্যতম লবঙ্গ সখা গৌড়লীলায় শ্রী কালাকৃষ্ণ দাস বা শ্রী কালিয়কৃষ্ণ দাস নামে অবির্ভূত হন। শ্রী কবি কর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন

"কালঃ শ্রী কৃষ্ণদাসঃ স যো লবঙ্গ ঃ সখা ব্রজে"। তিনি শ্রী নিত্যানন্দ শাখার অর্ন্তগত ছিলেন।

"রাঢ় দেশে জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
শ্রী নিত্যানন্দের তেঁহো পরম কিঙ্কর॥
কালাকৃষ্ণ দাস বড় বৈষ্ণব প্রধান।
নিত্যানন্দ চন্দ্র বিনা নাহি জানে আন॥"

(চৈ.চ. আদি ১১/৩৬-৩৭)।

আবার কেউ কেউ কালাকৃষ্ণ দাসকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শাখার অর্ন্তগত বলেন।

"প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাহার স্মরণে॥"

(চৈ. ভাগবত অন্ত্য ৫/৭৪০)।

যাই হোক কালাকৃষ্ণ দাস একাধারে মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুর যে পরম ভক্ত ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বর্ধমান জেলার (এই জেলার একাংশকেই রাঢ় দেশ বলা হতো) কাটোয়া থানার অর্ন্তগত আকাইহাট গ্রামে এক শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মন বংশে শ্রী কালাকৃষ্ণ দাস জন্ম গ্রহণ করেন। তৎকালীন সময়ে আকাই হাট বিরল বসতি এক অতি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন ভারতের দাক্ষিনাত্যে ভ্রমণ করতে যান তখন সার্বভৌম পন্ডিত এবং নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর সাথে এই কালাকৃষ্ণ দাসকে কিঙ্কর/দাস হিসাবে দিয়েছিলেন। তারা বলেছিলেন ঃ

কৃষ্ণ দাস নাম এই সরল ব্রাহ্মন।
ইহা সঙ্গে করি লহ, ধর নিবেদন॥
* * * * * * * * * * * * * *
কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মান।
যারে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ ভ্রমণ॥"

(চৈ. চ. আদি ৭/৩৯ এবং ১০/৪৫)।

শ্রী কালাকৃষ্ণ দাস আসলেই অতি সরল ছিলেন। একদিন দাক্ষিনাত্যের মল্লার অঞ্চলে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভ্রমণ করতে করতে বেতাপনি নামক স্থানে উপনীত হয়ে সেখানকার এক মন্দিরে শ্রী রঘুনাথজীকে দর্শন করে রাত্রিযাপন করেন। ঐ স্থানে ভট্টথারি নামক বামাচারী সন্যাসী সম্প্রদায় (স্ত্রী, মদ, মৃতদেহ ইত্যাদি নিয়ে যারা তান্ত্রিক মতে সাধন-ভজন করে) ছিল। তারা কৃষ্ণদাসকে সহজ-সরল বুঝে নানা প্রকার প্রলোভন দ্বারা মোহিত করে নিজেদের আশ্রমে নিয়ে যায়।

"স্ত্রী ধন দেখাঞা তার লোভ জন্মাইল।
অর্থ সরল বিপ্রের বুদ্ধি নাশ কৈল॥"
(চৈ. চ. মধ্য ৯/২২৭)।

নিদ্রাভঙ্গের পর মহাপ্রভু কালাকৃষ্ণ দাসকে দেখতে না পেয়ে ঘটনা বুঝতে পারলেন। তিনি ভট্টথারিগনের আশ্রমে গিয়ে কালাকৃষ্ণ দাসকে ফেরত চান। এতে ঐ পাষণ্ডীরা মহাপ্রভুকে আঘাত করতে উদ্যত হলে তাদের অনেকেই খণ্ড-বিখন্ড হয়ে যায়। বাকীরা ভয়ে চারদিকে পালিয়ে যায়। তখন মহাপ্রভু কালাকৃষ্ণ দাসকে নিয়ে আসেন। তারপর সেই স্থান ত্যাগ করে পরশ্বিনী নদীর তীরে আদি কেশব মন্দিরে গমন করেন। পরে মহাপ্রভু যখন পুরী ধামে ফিরে আসেন তখন সার্বভৌম পণ্ডিতকে ডেকে কৃষ্ণদাসের আচরনের কথা বলেন এবং তাকে বিদায় করে দেন। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে এর বর্ণনা রয়েছে।

"প্রভু কহে-ভট্টাচার্য শুন ইহার চরিত।
দক্ষিণ গিয়াছিল ইঁহ আমার সহিত॥
ভট্টথারি কাছে গেলা আমারে ছাড়িয়া।
ভট্টথারি হৈতে ইহাঁরে আনিলু ধরিয়া॥
ত্রবে আমি ইহাঁ আনি করিলাঙ্ বিদায়।
যাহা ইচ্ছা যাহ, আমা সনে নাহি আর দায়॥ "
(চৈ. চ. মধ্য ১০/৬২-৬৫)।

কালাকৃষ্ণ দাস তখন মহাপ্রভুর পদতলে পড়ে কাঁদতে থাকেন। পরে নবদ্বীপে শচীমাতা ও অপরাপর ভক্তবৃন্দকে প্রভুর দাক্ষিনাত্য থেকে ফিরে আসার সংবাদ জানানোর জন্য কালাকৃষ্ণ দাসকে সেখানে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

কালাকৃষ্ণ দাস এক সময় আকাইহাট থেকে হরিনাম প্রচার করতে করতে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলার সোনাতলা গ্রামে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি একটি আশ্রম গড়ে তোলেন। এই সোনাতলা গ্রামে এক সময় তিনি বিবাহ করেন। সেখানে মোহনদাস নামে তার এক পুত্র সন্তান হয়। এই পুত্রকে বিষয়াদি অর্পন করে সোনাতলায় রেখে তিনি স্ত্রীসহ বৃন্দাবনে গমন করেন। এখানে শ্রী গৌরাঙ্গ দাস নামে তার দ্বিতীয় সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে এই দ্বিতীয় পুত্রকে তিনি শ্রী বৃন্দাবন থেকে মোহনদাসের নিকট প্রেরণ করে বিষয় সম্পত্তির ছয় আনা গ্রহণের নির্দেশ দেন। ঐ সময় তিনি শ্রী গোবিন্দ জীউর অনুরূপ এক মূর্ত্তি শ্রী কালাচাঁদ বিগ্রহ পুত্র গৌরাঙ্গ দাসের সাথে সোনাতলায় পাঠিয়েছিলেন। গৌরাঙ্গ দাস সোনাতলায় এসে বড় ভাইয়ের সেবা করতে থাকেন। সোনাতলায় কালাকৃষ্ণ দাসের আশ্রমবাটীর ভিটা এবং মন্দিরের ইট এখনও দেখা যায়।

শ্রী কালাকৃষ্ণ দাস চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে অপ্রকট হন। আকাইহাটে তাঁর সমাধি আছে। এখনও সেখানে শ্রী শ্রী রাধা-বল্লভজীর সেবা হয়। তাঁর সমাধির পশ্চিমে একটি পুকুর আছে। এর নাম **"নুপুর কুন্ড"**। আকাই হাটে কালা কৃষ্ণদাসের তিরোভাব উৎসব হয়।

পূর্বে পাবনা জেলার সোনাতলা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত শ্রী শ্রী কালাচাঁদ জীউ কালাকৃষ্ণের বংশধরদের বাড়ীতে পালাক্রমে দুই মাস করে অবস্থান করতেন। অবশ্য পরে সোনাতলাতেই তাঁকে স্থায়ীভাবে রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়। সোনাতলাতে প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে কালাকৃষ্ণ দাসের তিরোভাব উৎসব হয়।

সুবল ⟹ গৌরীদাস পণ্ডিত

ব্রজলীলায় দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সুবলসখা গৌড়লীলায় শ্রী গৌরীদাস পণ্ডিত নামে আবির্ভূত হন। তিনি শ্রী নিত্যানন্দ শাখার অর্ন্তগত। শ্রী নিত্যানন্দ শাখা বর্ণনায় শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন ঃ

"শ্রী গৌরিদাস পণ্ডিতের প্রেমোদ্দন্ড ভক্তি।
কৃষ্ণ প্রেমা দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি॥
নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতিকুল পাঁতি।
শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দে করি প্রানপতি॥"
(চৈ. চ. আদি ঃ ১/২৬-২৭)।

শ্রী গৌরীদাস পণ্ডিত বর্ধমান জেলার কালনার নিকটে অম্বিকানগরে বসবাস করতেন। শালিগ্রামে তাঁর পূর্ব নিবাস ছিল। এ সম্পর্কে **ভক্তিসন্দর্ভঃ** গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

"সরখেল সূর্যদাস পণ্ডিত উদার।
তাঁর ভ্রাতা গৌরীদাস পণ্ডিত প্রচার॥
শালিগ্রাম হইতে জৈষ্ঠ ভ্রাতায় কহিয়া।
গঙ্গাতীরে কৈল বাস অম্বিকা আসিয়া॥
(ভক্তি সন্দর্ভ ঃ ৭/৩৩০-৩৩১)।

শ্রী গৌরীদাস পণ্ডিতের পিতার নাম কংসারী মিশ্র। মাতার নাম ⟹ কমলাদেবী। তাঁরা দুই ভাই ছিলেন। গৌরীদাসের ভাই সূর্যদাস সরখেল -এর কন্যা শ্রীমতি বসুধা এবং শ্রীমতি জাহ্নবার সাথে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ হয়েছিল। গৌরীদাসের স্ত্রীর নাম ⟹ বিমলা দেবী। তাঁদের দুই পুত্র। প্রথম বলরাম ও দ্বিতীয় রঘুনাথ। গৌরীদাসের বংশ পরিচয় নীচে দেয়া হলো।
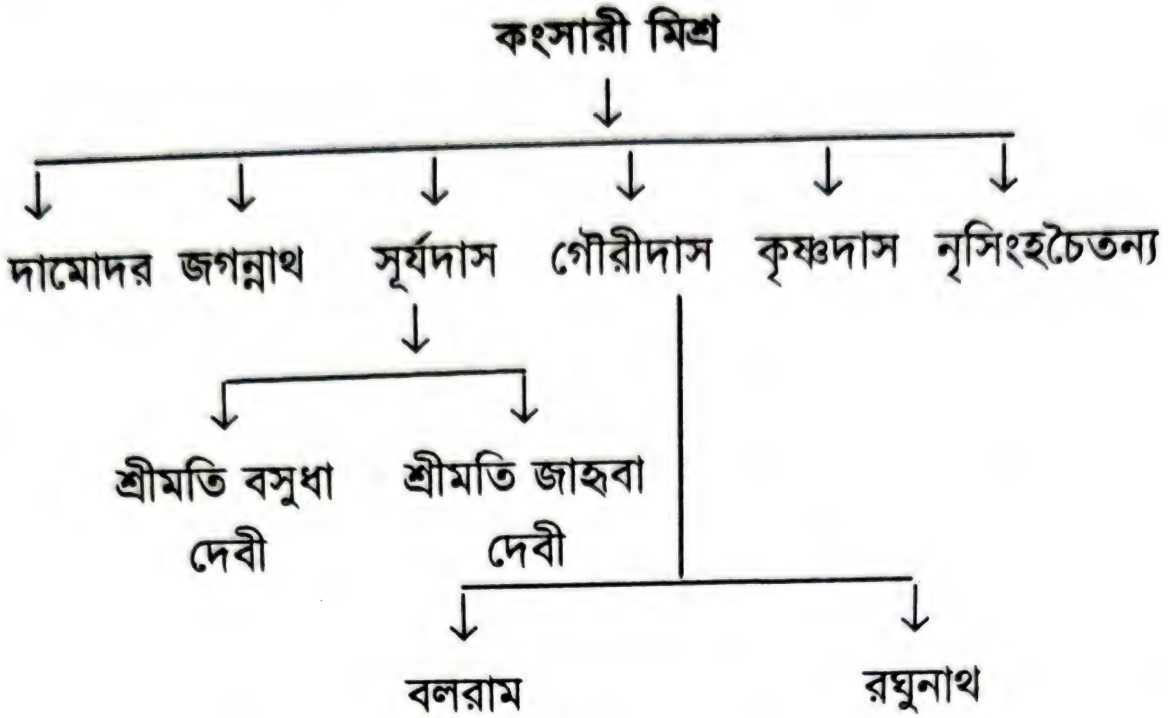
কথিত আছে একদা শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রী মন্ মহাপ্রভু হরিনদী গ্রাম থেকে নিজেরাই বৈঠা দ্বারা নৌকা বেয়ে গৌরীদাস পণ্ডিতের ভবনে উপনীত হয়ে বাইরের একটি তেতুল গাছের তলায় উপবেশন করেন। বহুদিন পর উভয় প্রভুকে পেয়ে গৌরীদাস আর ছাড়লেন না। চিরদিনের জন্য নিজের গৃহে তাঁদের রাখবার জন্য কাকুতি-মিনতি করতে থাকেন। তখন মহাপ্রভু সেখানকার একটি নিমগাছ দিয়ে শ্রী নিত্যানন্দ এবং তাঁর মূর্ত্তি নির্মান করে গৌরীদাসকে প্রদান করেন। গৌরীদাসের অচলা ভক্তিতে এই শ্রী বিগ্রহযুগল ভোগের দ্রব্যাদি ভোজন করেন।

কালনায় এখনও ঐ তেতুল গাছটি পরিদৃষ্ট হয়। আর মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু যে বৈঠা দিয়ে নৌকা বেয়ে এসেছিলেন তাও আজ অবধি মন্দিরে আছে। মহাপ্রভু উক্ত বৈঠা দিয়ে গৌরীদাসকে বলেছিলেন ঃ

"এই লহ বৈঠা, ত্রবে দিলাম তোমারে।
ভবনদী হৈতে পার করহ জীবেরে॥"
(ভক্তিসন্দর্ভ ঃ ৭/৩৩৬)।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু গৌরীদাসকে একখানি গীতাও দান করেন। মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে লিখিত গীতা ঐ মন্দিরে সংরক্ষিত আছে।

"প্রভুদত্ত গীতা, বৈঠা প্রভু সন্নিধানে।
অদ্যাপিহ অম্বিকায় দেখে ভাগ্যবানে॥"
(ভক্তিসন্দর্ভ ঃ ৭/৩৪১)।

শ্রী গৌরীদাসের প্রেমাধীন হয়ে এখনও অম্বিকা-কালনায় তাঁর গৃহে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজ করছেন।

গৌরীদাস পন্ডিতের গৃহে অবস্থানকালে একদিন শ্রী গৌর ও নিত্যানন্দ মৃদু হাস্যকরত তাকে বলেছিলেন ঃ হে গৌরীদাস তুমি পূর্বে সুবল সখা ছিলে। এসব কি তোমার মনে নেই? যমুনা পুলিনে আমরা কত বিলাস করেছি। শ্রী গৌর ও নিত্যানন্দ এরূপ আলাপ করতে করতে কৃষ্ণ-বলরাম মূর্ত্তি ধারণ করেন। সেই গোপবেশ, হাতে শিঙ্গা, বেত্র এবং বেনু (বাঁশী) এবং মাথায় ময়ুরের পুচ্ছ। গলায় বনমালা এবং চরনে নুপুর। শ্রী গৌরীদাসও পূর্বলীলার ভাব ধারণ করলেন। এভাবে তারা সবাই কিছুক্ষণ বিলাস করলেন। এর পরে মহাপ্রভুর ইচ্ছায় গৌরীদাস স্থির হলেন।

গৌরীদাস পণ্ডিত অনেক ধরণের ব্যঞ্জন তৈরী করে শ্রী গৌর ও নিত্যানন্দকে ভোগ দিতেন। সব সময় তাঁদের সেবায় তিনি তন্ময় হয়ে থাকতেন। নিজের শরীরের কষ্ট ও অসুবিধা নিয়ে কোন অনুভূতি নেই। যে স্থানে যে জিনিস ভাল আছে শুনতেন সেখানে গিয়ে তাই সংগ্রহ করে দুই প্রভুর ভোগে নিবেদন করতেন। এভাবে এক সময় পণ্ডিত বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হন। তাঁরপরও ঐরূপ ভোগ দেয়া থেকে বিরত হলেন না। তাঁর কষ্ট দেখে শ্রী গৌর-নিত্যানন্দ একদিন কাঠের মূর্ত্তি থেকে বাইরে এসে কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে অভুক্ত রইলেন। তখন পণ্ডিতও কৃত্রিম-রাগ করে বলতে থাকেন ঃ

"বিনা ভক্ষনেতে যদি সুখ পাও মনে।
তবে মোরে রন্ধন করাহ কি কারণে॥

গৌরীদাসের একথা শুনে দুই প্রভু হেসে বলেন ঃ

"অল্পে সমাধান নহে তোমার রন্ধন।
অন্নাদি করহ বহু প্রকার ব্যঞ্জন॥
নিষেধ না মান শ্রম দেখিতে না পারি।
অনায়াসে যে হয় তাহাই সর্বোপরি॥

শ্রী গৌর-নিত্যানন্দের এ কথা শুনে গৌরীদাস বললেনঃ আজকের জন্যতো ভোজন কর। পরবর্তীতে অনেক ব্যঞ্জন করে আর তোমাদের ভোজন করাব না। শাক মাত্র রান্না করে ভোজন করাব। গৌরীদাসের কথা শুনে দুজনে তখন ভোজন করতে আরম্ভ করেন।

গৌরীদাস পণ্ডিত শ্রী গৌর-নিত্যানন্দকে মনে মনে অনেক কিছু দিয়েই সাজাতে চাইতেন। কিন্তু তাঁর সাধ্য ছিল সীমিত। এজন্য সব সময় অনেক ইচ্ছা থাকা সত্বেও অসামর্থের জন্য তিনি তা পূরণ করতে পারতেন না। কিন্তু এতদ্‌সত্বেও দুই প্রভু গৌরীদাসের কোন ইচ্ছা অপূর্ণ রাখতেন না। তাঁরা নিজেরাই তা পূরণ করে দিতেন। যেমন একদিন গৌরীদাসের ইচ্ছা হল গৌর-নিত্যানন্দকে অলঙ্কার পড়াবেন। তাঁর এই ইচ্ছা অর্ন্তযামী প্রভুরা জানতে পেরে নিজেরাই বিভিন্ন অলঙ্কার পরে সিংহাসনে বিরাজ করতে লাগলেন। গৌরীদাস মন্দিরে প্রবেশ করে অবাক হলেন। ভাবলেন

এত অলঙ্কার কোথা থেকে আসল। তিনি আনন্দে আত্মহারা হলেন। শ্রী গৌর-নিত্যানন্দ গৌরীদাসের অনেক ইচ্ছা এভাবে পূরণ করে বিভিন্নরূপে নিজেদের লীলা বিলাস দেখাতেন।

গৌরীদাস এত বড় ভক্ত ছিলেন যে তাঁর মন্দির থেকে শ্রী গৌর ও নিত্যানন্দ কোথায়ও যান তা সহ্য করতে পারতেন না। কথিত আছে একবার প্রিয় শিষ্য শ্রী হৃদয় চৈতন্য তাঁর অনুমতি নিয়ে গঙ্গাতীরে শ্রী গৌরসুন্দরের জন্মোৎসব আরম্ভ করেন। হৃদয়-চৈতন্য ভক্তগনকে নিয়ে উদন্ড নৃত্য আরম্ভ করলে শ্রী গৌর ও নিত্যানন্দ মন্দির থেকে বের হয়ে এসে ঐ নৃত্যে অংশ গ্রহন করেন। এদিকে গৌরীদাস নিজে উৎসব করছেন। পুজারী গঙ্গাদাস মন্দিরে প্রবেশ করে দেখতে পান সিংহাসনে শ্রী গৌর-নিত্যানন্দ নেই। তিনি গৌরীদাসকে বিষয়টি জানালেন। পন্ডিত বুঝতে পারলেন যে হৃদয় চৈতন্যের প্রেমে বশীভূত হয়ে দুই ভাই তাঁর কীর্ত্তনে যোগ দিয়েছেন। গৌরীদাস তখন মৃদ হেসে একখানি লাঠি হাতে গঙ্গার তীরে যেখানে কীর্ত্তন হচ্ছিল সেখানে গিয়ে উপনীত হন। তাঁর কৃত্রিম রাগ দেখে শ্রী গৌর ও নিত্যানন্দ মন্দিরে গিয়ে প্রবেশ করেন।

"দুই ভাই দেখি পন্ডিতের ক্রোধাবেশ।
অলক্ষিতে গিয়া কৈল মন্দিরে প্রবেশ॥"

এরপর গৌরীদাস নিজের গৃহে ফিরে এসে মন্দির প্রাঙ্গনে মহাসংকীর্ত্তন নৃত্য আরম্ভ করেন। এরূপে শ্রী গৌর সুন্দরের জন্মোৎসব শেষ হয়। এরপরই গৌরীদাস তাঁর প্রিয় শিষ্য হৃদয়চৈতন্যকে শ্রী বিগ্রহদ্বয়ের সেবার অধিকার প্রদান করেন।

কোন এক শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রী গৌরীদাসের তিরোভাব হয়।

বসুদাম ⇒ ধনঞ্জয় পণ্ডিত

ব্রজলীলায় দ্বাদশ গোপালের অন্যতম বসুদাম সখা গৌর লীলায় ধনঞ্জয় পণ্ডিত নামে আবির্ভূত হন। শ্রী ধনঞ্জয় পণ্ডিতের মহিমা কীর্ত্তন করতে গিয়ে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁর শ্রী চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"ধনঞ্জয় পণ্ডিত মহান্ত বিলক্ষন।
যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ সর্বক্ষন॥"
(চৈ. ভাগবত অন্ত্য ৫/৭৩৩)।

শ্রী ধনঞ্জয় পণ্ডিত বর্ধমান জেলায় মঙ্গলকোট থানার অর্ন্তগত শীতল গ্রামে বসবাস করতেন। কেউ কেউ বলেন ধনঞ্জয় পণ্ডিতের পূর্ব নিবাস ছিল বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার অর্ন্তগত জাড় গ্রামে। তাঁর পিতার নাম ⇒ শ্রী পতি বন্দোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ⇒ কালিন্দী দেবী। আবার শ্রী গৌরাঙ্গ মাধুরী গ্রন্থ মতে পশ্চিম

বঙ্গের বীরভূম জেলার বোলপুরের নিকটবর্তী সিয়ানমুলুক গ্রামে আদিদেব বাচস্পতির ঔরসে এবং দয়াময়ী দেবীর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। তবে বেশীরভাগ মতে তিনি চট্টগ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন। বড় হয়ে ধনঞ্জয় সেখান থেকে এসে শীতল গ্রামে শ্রী বিগ্রহ সেবা প্রকাশ করেন। শীতল গ্রামের প্রবেশ পথের বামদিকের তুলসী বেদীকেই ধনঞ্জয় পণ্ডিতের সমাধি বলে। এখানে বিগ্রহ রয়েছেন ⇒ শ্রী গৌর-নিতাই, শ্রী গোপীনাথ ও শ্রী দামোদর।

বাল্যকালে ধনঞ্জয় তুলসীদেবীকে দিনে তিনবার সাষ্টাঙ্গে প্রনাম করতেন। কথিত আছে অল্পবয়সে হরি প্রিয়া নামক একজন কিশোরীর পানি গ্রহণ করলেও (বিবাহ) তিনি অল্প দিনের মধ্যেই সংসার ত্যাগ করে তীর্থ পর্যটনের জন্য বের হয়ে যান। তাঁর ধনী পিতা তাকে পথ-খরচা বাবদ প্রচুর অর্থ দিয়েছিলেন। কিন্তু এক সময় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দর্শন পেয়ে তিনি সমস্ত অর্থ প্রভুকে দিয়ে বিবাগী হন।

"বিলাসী বৈরাগী বন্দো পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
সর্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভান্ড হাতে লয়॥
(বৈষ্ণব বন্দনা)।

শীতল গ্রামের বহু দস্যু ও পাষণ্ড ধনঞ্জয় পণ্ডিতের কৃপায় ভক্ত হয়েছিলেন। নবদ্বীপে অবস্থানকালে তিনি মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-বিলাসে অংশ নিতেন। নবদ্বীপ থেকে একসময় আবার শীতল গ্রামে ফিরে আসেন। সেখানে কিছুদিন থেকে শ্রী বৃন্দাবনে যাত্রা করেন। পথে সাচড়া-পাঁচড়া গ্রামেও কয়েকদিন ছিলেন বলে ঐ স্থানকেও ধনঞ্জয়ের বাসস্থান বা শ্রীপাট বলা হয়। বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে তিনি জলন্দী নামক গ্রামেও শ্রী বিগ্রহ সেবা প্রকাশ করেছিলেন। এই স্থানে শ্রী শ্রী নিতাই গৌর, শ্রী শ্রী গোপীনাথ এবং শ্রী শ্রী দামোদর শালগ্রাম সেবিত হন।

ধনঞ্জয় পন্ডিতের নিজের কোন বংশধর ছিল না। শ্রী সঞ্জয় নামে তাঁর এক ছোট ভাই ছিলেন। এই ভাইয়ের পুত্রের নাম কানাই ঠাকুর। এঁর বাসস্থান বোলপুরের নিকটবর্তী মুলুক গ্রামে ছিল। কেউ কেউ বলেন সঞ্জয় ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। শীতল গ্রামে শ্রী বিগ্রহের এখন যারা সেবাইত আছেন তাঁরা ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য-বংশধর। ধনঞ্জয় পণ্ডিতের এক শিষ্য শ্রী জীবনকৃষ্ণের স্থাপিত শ্রী শ্রী শ্যাম সুন্দর জীউ বর্তমানে শ্রী গোপাল রায় চৌধুরীর বাসভবনে আছেন। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শ্রী ধনঞ্জয় পণ্ডিত শীতল গ্রামেই অপ্রকট হন। শীতল গ্রামেই শ্রী ধনঞ্জয় পণ্ডিতের সমাধি মন্দির বিরাজমান।

অর্জুন ⇒ পরমেশ্বরী দাস (ঠাকুর) ব্রজলীলায় যিনি শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জুন ছিলেন তিনিই গৌরলীলায় শ্রী পরমেশ্বরী দাস ঠাকুর (বা পরমেশ্বর দাস) নামে আবির্ভূত হন। তিনি বৈদ্যকুলে আবির্ভূত হন। তবে তার বাসস্থান সম্পর্কে মতভেদ

আছে। এক মতে তাঁর শ্রীপাট/বাসস্থান ছিল আটপুরে। হাওড়া-আমতা রেল লাইনের চাঁপাডাঙ্গা শাখায় আটপুর রেল ষ্টেশন। এই স্থানের পূর্ব নাম ছিল বিশাখালা [**দ্রষ্টব্য ঃ শ্রী হরিকৃপা দাস ঃ শ্রী শ্রী গৌর পার্ষদ চরিতাবলী পৃঃ ৩৪৩**] আর এক মতে শ্রীপাট কেতুগ্রাম বা কাউ গ্রামে ছিল। সেখান থেকে এসে খড়দহে বসবাস করেন [**দ্রষ্টব্য ঃ গৌরগনোদ্দেশ দিপীকা পৃঃ ১৩২**] মতান্তরে তাঁর শ্রীপাট সাচঁড়াতে ছিল।

"সাঁচড়াতে পরমেশ্বর দাসের বসতি।
পরমেশ্বর অর্জুন সখা পূর্বে এই খ্যাতি॥
বিরন গাঁ, সাঁচড়া-পাঁচড়া সর্বজন কহে॥"
(শ্রী পাট পর্যটন)।

পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দ শাখার অর্ন্তগত ছিলেন। শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রী নিত্যানন্দ শাখা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন।

"পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দৈক শরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায় তারে যে করে স্মরণ।"
(চৈ. চ. আদি ১১/২৯)।

অন্যদিকে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখেছেন ঃ

"নিত্যানন্দ জীবন পরমেশ্বর দাস।
যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস॥
কৃষ্ণদাস পরমেশ্বর দাস দুই জন।
গোপভাবে হৈ হৈ করে অনুক্ষন॥"
(চৈ. ভাগবত অন্ত্য ৫/২৪০)।

শ্রী পরমেশ্বর দাস বৃন্দাবন থেকে আগমনকালে পরলগাছা গ্রামে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। তিনি শ্রী জাহ্নবা মাতার (নিত্যানন্দ প্রভুর স্ত্রী) আদেশে তড়াআটপুরে শ্রী রাধা গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময় জাহ্নবা মাতা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তিনি জাহ্নবা মাতার অতি প্রিয় সেবক ছিলেন।

"ঈশ্বরীর মনোবৃত্তি কে বুঝিতে পারে।
শ্রী পরমেশ্বরী দাসে কহে ধীরে ধীরে।
তড়াআটপুরে গ্রামে শীঘ্র করি যাহ।
তথা রাধাকৃষ্ণ গোপীনাথ সেবা প্রতিষ্ঠাহ॥
ঈশ্বরী আজ্ঞায় শ্রী পরমেশ্বরী দাস।
রাধা গোপীনাথ সেবা করিলা প্রকাশ॥"
(ভক্তিসন্দর্ভ ঃ বহরমপুর সংস্করন)।

শ্রী পরমেশ্বর দাস জাহ্নবা মাতার সাথে বৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রী জাহ্নবা মাতা যখন খেতরির মহোৎসবে যান তখন তাঁর সাথে শ্রী পরমেশ্বর দাসও ছিলেন। এছাড়া জাহ্নবা মাতা বৃন্দাবনে শ্রী গোবিন্দদেবের জন্য যে শ্রী রাধা মূর্ত্তি নির্মান করে পাঠান সেই মূর্ত্তির সাথে পরমেশ্বর দাস ছিলেন।

শ্রী পরমেশ্বর দাসের অনেক অলৌকিক শক্তি ছিল। কথিত আছে একদা আকনা-মাহেশ গ্রামে (হুগলী জেলার শ্রী রামপুর মহকুমার কাছে) শ্রী কমলাকর পিপ্‌লাইয়ের বাসস্থানে হরিনাম সংকীর্ত্তন হচ্ছিল। শ্রী পরমেশ্বর দাস সেখানে হরি প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে নৃত্য করছিলেন। ঐ সময় কিছু পাষণ্ড লোক পথিমধ্যে একটি মৃত শিয়াল পেয়ে সেটিকে এনে সংকীর্ত্তন দলের মধ্যে নিক্ষেপ করে। পরমেশ্বর দাস ছিলেন অক্রোধী বৈষ্ণব। তিনি দুষ্টগনের প্রতি রুষ্ট (রাগান্বিত) হলেন না। তাঁর গুনে অলৌকিকভাবে সেই মৃত শিয়ালটি জীবিত হয়ে সেখান থেকে চলে যায়। শ্রী **বৈষ্ণব বন্দনায়** আছে –

"পরমেশ্বর দাস বন্দিব সাবধানে।
শৃগালে লওয়ান নাম সংকীর্ত্তন-স্থানে।
(শ্রী দেবকী নন্দনদাস ঃ শ্রী বৈষ্ণবন্দনা)।

কথিত আছে যে শ্রী পরমেশ্বর দাস এক সময় তড়াআটপুরে দুটি দন্তকাষ্ঠ মাটিতে পুতে রাখেন। এগুলো অতিসত্ত্বর দুটি বড় বকুল গাছে পরিণত হয়। আজও সেখানে ঐ গাছ দুটি বর্তমান আছে। শ্রী নরোত্তম দাস ঠাকুর খড়দহে আগমন করলে তিনি তাকে পুরীধামের পথের বিবরণ জ্ঞাপন করেছিলেন।

শ্রী পরমেশ্বর দাস বৈশাখ মাসের (মতান্তরে জৈষ্ঠ্য মাস) পূর্নিমা তিথিতে অপ্রকট হন। তাঁর শ্রীপাটে শ্রী রাধা গোবিন্দদেব বিরাজমান আছেন। এই মন্দিরের সামনে কথিত বকুল গাছ দুটি বর্তমান। এদের মধ্যস্থানে পরমেশ্বর দাসের সমাধি মন্দির। তিনি সংকীর্ত্তনে যে খুন্তি ব্যবহার করতেন তার তিরোভাব তিথিতে সেটি সমাধির পাশে বসানো হয়।

স্তোক কৃষ্ণ ⇒ পুরুষোত্তম দাস

ব্রজলীলায় যিনি শ্রীকৃষ্ণের স্তোককৃষ্ণ সখা ছিলেন, গৌড়লীলায় তিনিই পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর নামে অবির্ভূত হন।

"স্তোক কৃষ্ণ যেঁহো তেঁহো দাস পুরুষোত্তম।" (ভক্তমাল-৩)।

তিনি শ্রী সদাশিব কবিরাজের পুত্র ছিলেন। শিশুকাল থেকেই শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণ ধ্যান করতেন। পরবর্তীতে নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য হন। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে বলা আছে ঃ

"শ্রী সদাশিব কবিরাজ- বড় মহাশয়।

শ্রী পুরুষোত্তমদাস - তাঁহার তনয়॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণ সনে॥
(চৈ. চ. আদি ১১/৩৮-৩৯)।

শ্রী চৈতন্য ভাগবতেও পুরুষোত্তম দাস সম্পর্কে বলা হয়েছে –

"সদাশিব কবিরাজ মহাভাগ্যবান।
যাঁর পুত্র পুরুষোত্তম দাস নাম॥
বাহ্য নাহি পুরুষোত্তম দাসের শরীরে।
নিত্যানন্দ চন্দ্র যাঁর হৃদয়ে বিহরে॥"
(চৈ. ভাগবত অন্ত্য ৫/৭৪১-৭৪২)।

শ্রী পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরের চারজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। এদের মধ্যে শ্রী মাধবাচার্য, শ্রী যাদবাচার্য ও শ্রী দেবকীনন্দন ছিলেন প্রধান। এঁরা কুলীন ব্রাহ্মন বংশীয় ছিলেন। শ্রী মাধবাচার্য ছিলেন শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবীর স্বামী। শ্রী দেবকীনন্দন দাস **বৈষ্ণব বন্দনা** এবং **বৈষ্ণব অভিধান** রচনা করেন। এঁর রচিত পদাবলী উন্নতমানের।

শ্রী পুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রী বিগ্রহগন পূর্বে তাঁর শ্রীপাট (বাসস্থান) নদীয়া জেলায় চাকদহ্ ও শিমুরালী রেলষ্টেশন থেকে কিছুটা দূরে সুখ সাগরে ছিল। সুখ সাগর গ্রাম ধ্বংস হওয়ার পর শ্রী বিগ্রহগণকে চান্দুরায় আনা হয়। বর্তমানে জিরাটের গঙ্গা বংশগণের তত্ত্বাবধানে অপরাপর বিগ্রহগন সহ শ্রী পুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রী বিগ্রহগণ সেবিত হচ্ছেন। পুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাট বসুজাহ্নবার পাট নামে অভিহিত।

শ্রী পুরুষোত্তম দাসের পুত্রের নাম ছিল শ্রী কানু ঠাকুর। তিনি কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত হতেন। তাঁর সম্পর্কে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে ঃ

"তাঁর পুত্র-মহাশয় শ্রী কানু ঠাকুর।
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ প্রেমামৃত পুর॥"
(চৈ.চ. আদি ১১/৪০)।

শ্রী কানু ঠাকুর সম্পর্কে এরূপ প্রবাদ আছে ঃ শ্রী পুরুষোত্তম ঠাকুরের স্ত্রীর নাম জাহ্নবা ছিল। ঠাকুর কানাইর জন্মের পর জাহ্নবা অপ্রকট হন। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু একথা শুনে পুরুষোত্তমের গৃহে আসেন এবং শিশু কানুকে খড়দহ গ্রামে নিয়ে যান। শ্রী কানু ঠাকুর বাংলা ৯৪২ সালের আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রী কানু ঠাকুর বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত কৃষ্ণভক্তি পরায়ন ছিলেন। এই ভক্তি দেখে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর আর এক নাম দিয়েছিলেন শিশুকৃষ্ণ দাস।

শ্রী কানাই ঠাকুর মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবা মাতার সাথে বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানেই শ্রী জীব গোস্বামী প্রমুখ আচার্যগণ তার নাম রাখেন ঠাকুর কানাই। কথিত আছে যে শ্রী বৃন্দাবনে ঠাকুর কানাই কীর্ত্তনের সাথে যখন নৃত্য করছিলেন তখন তাঁর ডান পায়ের একটা নূপুর অর্ন্তহিত হয়ে যায়। ঐ সময় তিনি বলেন, যে স্থানে এই নূপুর গিয়ে পড়ে আছে সেখানে আমি বসবাস করবো। যশোর জেলায় বোধখানা নামক গ্রামে ঐ নূপুর পতিত হয়। তারপর থেকেই শ্রী কানাই ঠাকুর বোধখানায় এসে বসবাস করতে থাকেন।

তৎকালীন বঙ্গে বর্গীয় হাঙ্গামার সময় শ্রী কানাই ঠাকুরের বংশধরগণ শ্রী বিগ্রহসহ বোধখানা ত্যাগ করে নদীয়া জেলার ভাজনঘাট গ্রামে এসে বসবাস করতে থাকেন। বর্গীয় হাঙ্গামা শেষ হওয়ার পর কানাই ঠাকুরের ছোট ছেলের বংশধর শ্রী হরিকৃষ্ণ গোস্বামী পুনরায় বোধখানাতে এসে বসবাস শুরু করেন। তিনি প্রাণ বল্লভ নামক শ্রী বিগ্রহ স্থাপন করেন।

"প্রেম বিলাস" গ্রন্থ থেকে দেখা যায় শ্রী কানাই ঠাকুর খেতরির মহোৎসবে শ্রী জাহ্নবা মাতার সাথে উপস্থিত ছিলেন। শ্রী পুরুষোত্তম ঠাকুরের যেমন অনেক ব্রাহ্মন শিষ্য ছিল তেমনি শ্রী কানাই ঠাকুরেরও বহু ব্রাহ্মন শিষ্য ছিল।

যশোরের বোধখানায় এবং নদীয়ায় ভাজনঘাটে শ্রী পুরুষোত্তম ঠাকুরের বংশীয়দের বাসস্থান আছে। এই বংশেই প্রসিদ্ধ শ্রী কৃষ্ণকমল গোস্বামী "রাই উন্মাদিনী বিচিত্র বিলাসাদি" রচনা করে বহু নরনারীকে ব্যাকুল করেছিলেন।

মহাবাহু ⇒ মহেশ পণ্ডিত

শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহেশ পণ্ডিতকে ব্রজলীলার উদার গোপাল বলেছেন।

"মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল।
ঢক্কা বাদ্যে নিত্য করে প্রেমে মাতোয়াল॥"
(চৈ. চ. আদি ১১/৩২)।

তিনি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে মাতালের মতো নৃত্য করতেন।

গৌরগনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থে মহেশ পণ্ডিতকে ব্রজের মহাবাহু গোপাল বলা হয়েছে ঃ "মহেশঃ পণ্ডিতঃ শ্রীমন্মহাবাহুর্জে সখা।"

কেউ কেউ বলেন মহেশ পণ্ডিত যশোড়ার শ্রী জগদীশ পণ্ডিতের ছোট ভাই ছিলেন। তবে এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকায় সন্দেহ আছে। প্রথমে মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট (বাসস্থান) সরডাঙ্গায় ছিল। পরে মশিপুরে হয়। কিন্তু গঙ্গার ভাঙ্গনে এই দুই গ্রামই নষ্ট হয়ে গেলে বেলেডাঙ্গায় কিছুদিন থেকে তিনি বর্তমান নদীয়া

জেলায় চাক্‌দহের নিকট পাল পাড়ায় বসবাস করতে থাকেন। আবার চৈতন্য সংহিতা নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে মহেশ পণ্ডিতের বাসস্থান বরাহনগরে ছিল।

খড়দহে শ্রী মহেশ পণ্ডিতের যাতায়াত ছিল। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের অষ্টম তরঙ্গে দেখা যায় শ্রী নরোত্তম ঠাকুর যখন খড়দহে আগমন করেন তখন তিনি মহেশ পণ্ডিতের দেখা সেখানে পান। উভয়ের মধ্যে এরূপ প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয় যে এক সময় নরোত্তম ঠাকুরকে বিদায় দিয়ে মহেশ পণ্ডিত স্থির থাকতে পারেন নাই।

"মহেশ পণ্ডিত আসি অতিশয় স্নেহে।
নরোত্তমে বিদায় করিয়া স্থির নহে॥"
(ভক্তিরত্নাকর ৮/২২০)।

মহেশ পণ্ডিত শ্রী নিত্যানন্দের সহচর ছিলেন। তাঁর সাথে মহেশ পণ্ডিত পানিহাটীর চিড়া-দধি মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন (চৈ.চ. অন্ত্য ৬/৬২)। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহেশ পণ্ডিতকে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর পরম প্রিয়জন বলে আখ্যায়িত করেছেন। মহেশ পণ্ডিতের অপ্রকটকালীন সাল জানা যায় না। তবে তিনি কোন এক পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশ তিথিতে অপ্রকট হয়েছিলেন।

মধুমঙ্গল ⟹ শ্রীধর ঠাকুর

ব্রজলীলায় যিনি শ্রী কৃষ্ণের মধুমঙ্গল নামে সখা ছিলেন গৌড়লীলায় তিনিই শ্রী ধর ঠাকুর নামে অবির্ভূত হন।

শ্রী ধর ঠাকুর শ্রী মায়াপুর গ্রামের শেষ সীমায় বসবাস করতেন। তিনি একজন দরিদ্র লোক ছিলেন। সামান্য কলা-মূলা ও শাকশব্জী, থোড়-মোচা ইত্যাদি বিক্রি করে জীবন যাপন করতেন। রাত ভোর উচ্চস্বরে হরিনাম করতেন। কিন্তু তৎকালীন ভক্তি বিমুখ পাষণ্ড হিন্দুগন তা সহ্য করতে পারতো না। অকথ্য ভাষায় তাঁকে নানাভাবে গালি-গালাজ করতো।

"মহাচাষা-বেটা ভাতে পেট নাহি-ভরে।
ক্ষুধার ব্যাকুল হঞা রাত্রি জাগি-মরে॥"
(চৈ. ভাগবত মধ্য ৯/১৪৮)।

চাষাবেটার ভাতে পেট ভরে না। তাই ক্ষুধার জ্বালায় রাতে চিৎকার করে- পাষন্ডীগণ শ্রী ধর সম্পর্কে এরূপ অনেক কথা বলতো। কিন্তু শ্রী ধর এসব কথায় কর্ণপাত করতেন না। নিজের আনন্দে কাজ করে যেতেন। শ্রী মায়াপুর থেকে কিছুটা দূরবর্তী বামনপুকুর বাজারে তাঁর দোকান ছিল। দোকানে তিনি শাকশজি, কলা-মূলা, খোঁড়-মোচা ইত্যাদি বিক্রি করতেন। তিনি খুব সত্যবাদী লোক ছিলেন। দোকানে বসেও শ্রী নাম স্মরণ করতেন। একদামে জিনিসপত্র বেচা-কেনা করতেন। বেশী কথা এ ব্যাপারে বলতেন না। ক্রেতারাও সঠিক দাম দিয়ে তাঁর কাছ থেকে

জিনিসপত্র কিনতে ভালবাসতো। শ্রীধর থোড়, কলা-মূলা ইত্যাদি বিক্রি করে যে অর্থ উপার্জন করতেন তার অর্ধেক দিয়ে শ্রী গঙ্গাদেবীর পুজার জন্য প্রয়োজনীয় ফল-ফুল, মিষ্টি ইত্যাদি কিনতেন। বাকী অর্ধেক দিয়ে নিজের সংসার চালাতেন।

শ্রী গৌরসুন্দর তখন কিশোর ছিলেন। কোন কোন দিন মায়ের আদেশে তিনি শাক-কলা-মূলা ইত্যাদি কিনতে বামনপুকুর বাজারে যেতেন। সেখানে তিনি শ্রী ধরের দোকান থেকে এসব জিনিস কিনতেন। কোন কোন দিন জিনিসপত্র কেনার সময় শ্রী গৌর শ্রীধর ঠাকুরের সাথে নানা ধরনের রহস্য এবং পরিহাস করতেন।

"খোলা বেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয় দাস।
যার সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস॥"
(চৈ. চ. আদি ১০/৬৭)।

শ্রীধর একদামে জিনিসপত্র বিক্রি করতেন। শ্রী গৌরসুন্দর তার অর্ধেক দাম বলতেন। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হতো। কোন কোন দিন শ্রীধর শ্রী গৌরসুন্দরের হাত থেকে কলা-মূলা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করতেন। গৌরসুন্দর ছেড়ে দিতেন না। দু'জনের মধ্যে জিনিসপত্র নিয়ে শেষে টানা-হেচড়া হতো। তাদের এরূপ কাজ দেখে লোকজন জড়ো হয়ে যেত। প্রভু তখন বলতেন যে শ্রীধর ধনী। তার অনেক অর্থ আছে। তাই সে ইচ্ছা করলে কম দামে জিনিস দিতে পারে। কোন কোন সময় কৃত্রিম রাগ করে বলতেন যে তিনি কে তা শ্রীধর জানে না। জানলে তাঁর হাত থেকে কলা-মূলা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করতেন না।

"আমার হাতের দ্রব্য লহ যে কাড়িয়া।
এতদিন কে আমি, না জানিস ইহা॥"

আবার অন্য সময়ে শ্রী গৌরসুন্দর বলতেন শ্রীধর যে গঙ্গাদেবীকে পূঁজা করেন তার পিতাই হলেন তিনি।

"যে গঙ্গা পূঁজহ তুমি আমি তার পিতা।
সত্য সত্য তোমারে কহিলাম এই কথা॥"
(চৈ. ভাগবত মধ্য ৯/১৭৩)।

শ্রী গৌরসুন্দরের এ কথা শুনে শ্রীধর বিষ্ণু বিষ্ণু বলে কানে আঙ্গুল দেন। তিনি মনে করতেন এই কিশোর বোধ হয় পাগল হয়েছে। কিন্তু পরক্ষনেই গৌরসুন্দরের মদন মোহন রূপ, তিলক, পরিধানের বসন, কুঞ্চিত কেশ, গলায় শুভ্র পৈতা, এবং দুই চোখের সুষমা নিরীক্ষণ করে বুঝতে পারলেন যে এই কিশোর সাধারণ কেউ নয়। এর পর থেকে শ্রীধর মহাপ্রভুকে কম দামে বিভিন্ন জিনিস দিতেন এবং কখনো কখনো কোন কোন জিনিসের দাম নিতেন না। শ্রী গৌরসুন্দরও প্রতিদিন শ্রীধরের খোঁড়-মোচার তরকারী তার কলার-খোলায় ভোজন করতেন। কারণ ভগবান ভক্তের জিনিসই গ্রহণ করেন, অভক্তের জিনিস চোখেও দেখেন না।

"ভক্তের পদার্থ প্রভু হেনমতে খায়।
কোটী হৈলেও অভক্তের উলটি না চায়॥"
(চৈ. ভাগবত আদি ৯/১৮৫)।

শ্রী গৌরসুন্দর পরবর্তীকালে শ্রীধরকে কৃপা করেছিলেন। প্রভু বিদ্যা শিক্ষার পর গয়াধামে যান। সেখানে থেকেই তাঁর দিব্য প্রকাশ আরম্ভ হয়। যখন নবদ্বীপে ফিরে আসেন তখন তাঁর সম্পূর্ণ নুতন ভাব। আর শ্রীবাস পণ্ডিতের অঙ্গনেই তাঁর এই বিলাস-ভাবের প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাড়ায়। একদিন মহাপ্রভু মহাভাবে সমবেত ভক্তগণকে আদেশ করলেন - শ্রীধরকে এখানে নিয়ে এস। সে আমার স্বরূপ দর্শন করুক। আমাকে দেখবার জন্য সে কত দুঃখ কষ্ট সহ্য এবং সাধন করেছে। রাতে ভক্তরা শ্রীধরকে আনতে গেলেন। দূর থেকে ভক্তরা শুনতে পেলেন শ্রীধর উচ্চস্বরে হরিনাম করছেন। ভক্তগণ শ্রীধরের বাড়ীতে গিয়ে তাকে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু জোরে জোরে হরিনাম করায় প্রথমে শ্রীধর ভক্তগণের ডাক শুনতে পেলেন না। কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর শ্রীধর বাইরে এসে চন্দ্রালোকে ভক্তদের দেখতে পেয়ে অবাক হলেন। তারা এত রাতে কেন এসেছেন জিজ্ঞেস করলেন। ভক্তগণ বললেন শ্রীধর! প্রভু তোমাকে ডাকছেন। তোমাকে নেবার জন্য আমরা এসেছি। কালবিলম্ব না করে চল। শ্রীধর এতে আনন্দে হতবিহ্বল হয়ে পড়েন।

"শুনিয়া প্রভুর নাম শ্রীধর মুচ্ছিত।
আনন্দে বিহ্বল হই পড়িয়া ভূমিত॥"
(চৈ. ভাগবত মধ্য ৯/১৫৪)।

আগত ভক্তগণ তখন শ্রীধরকে ধরাধরি করে মহাপ্রভুর নিকটে নিয়ে আসেন। মহাপ্রভু তখন আনন্দে বলতে লাগলেন ঃ এস এস আমাকে দেখবার জন্য তুমি জন্ম জন্ম সাধন করেছ। এ জন্মেও আমার অনেক সেবা করেছ। তোমার শাক্, কলা, মোচা ইত্যাদি আমি অতি প্রীতিভাবে ভোজন করেছি। শ্রীধর তুমি কি এসব ভুলে গেছ? তুমি উঠ এবং আমার দিব্য রূপ দর্শন কর। এই রূপ শ্রুতিগণও দর্শন করতে পারে না। আস্তে আস্তে ভূমি থেকে উঠে শ্রীধর প্রভুর দিব্য রূপ দর্শন করতে লাগলেন।

"তমাল শ্যামল দেখে সেই বিশ্বম্ভর।
হাতে মোহন বাঁশী দক্ষিনে বলরাম॥
মহাজ্যোতির্ন্ময় সব দেখে বিদ্যমান॥
কমলা তাম্বুল দেই হাতের উপরে।
চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ আগে স্তুতি করে॥"
(চৈ. ভাগবত মধ্য ৯/১৯০-১৯৩)।

শ্রী শ্যাম সুন্দর রূপে মহাপ্রভুকে দর্শন করে শ্রীধর পুনরায় প্রেমে আপ্লুত হয়ে মাটিতে মুচ্ছিত হয়ে পড়েন। তখন মহাপ্রভু তাকে স্পর্শ করে জ্ঞান দান করলেন। তিনি শ্রীধরকে তাঁর স্তুতি করতে বললেন। শ্রীধর বললেন - প্রভু আমিতো কিছুই জানি না। মহাপ্রভু বললেন শ্রীধর তোমার বাক্যই আমার স্তুতি। আমি বর দিচ্ছি তোমার জিহ্বায় সরস্বতীর অধিষ্ঠান হোক। তখন শ্রীধর স্তব করতে লাগলেন।

জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় জয় নবদ্বীপ পুরসুন্দর॥
জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মান্ডকোটী নাথ।
জয় জয় শচী পূণ্যবতী গর্ভপাত॥
জয় জয় বেদগোপ্য জয় দ্বিপরাজ।
যুগে যুগে ধর্ম পাল করি নানা সাজ॥"

(চৈ. ভাগবত মধ্য ৯/২০০-২০২)।

এভাবে শ্রীধর প্রায় অদ্ধ প্রহর কাল প্রভুর স্তুতি করলেন। এতে প্রভু খুশী হয়ে বললেন- শ্রীধর তুমি বর গ্রহণ কর। শ্রীধর কোন বর নিতে চাইলেন না, বরং প্রভুকে তার জন্মে জন্মের নাথ হওয়ায় জন্য কামনা করলেন।

"যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলাপাত।
সে ব্রাহ্মন হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ॥
যে ব্রাহ্মন মোর সঙ্গে করিল কোন্দল।
মোর প্রভু হউক তাঁর চরণ যুগল॥"

(চৈ ভাগবত মধ্য ৯/২২৪-২২৫)।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীধরের উপরোক্ত প্রার্থনা শুনে তাকে বললেন যে জন্মে জন্মে তিনি প্রভুর দাস ছিলেন। তার অনেক পরীক্ষা হয়েছে। মহাপ্রভু তার আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন যে তিনি শ্রীধরের সেবা ও প্রেমে ঋণী হয়েছেন। এভাবে শ্রীধরের ধন,জন, বল, বিদ্যা, পান্ডিত্য, রূপ, যশ এবং উত্তম কূল (বংশ) না থাকা সত্ত্বেও তিনি মহাপ্রভুর কৃপাধন্য হলেন যা অন্যের পক্ষে দুর্লভ।

"কলা-মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটি কল্পে কোটীশ্বর না দেখিবে তাহা॥"

(চৈ. ভাগবত ৯/২৩৩)।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু সন্যাসে যাওয়ার দিন ভক্তগণকে নিয়ে নগরে নগরে অনেক নৃত্য কীর্ত্তন করেন। সন্ধার সময় প্রভুর গৃহে বিভিন্ন ভক্ত আসছেন-যাচ্ছেন। তিনি হাসতে হাসতে ভক্তগণকে নিজের গলার মালা দান করছেন। এক সময় শ্রীধর ঠাকুর একটি লাউ হাতে উপস্থিত হন। প্রভু তার লাউটি নিজের হাতে নিয়ে হাসতে থাকেন। তিনি শচী মাতার হাতে লাউটি অর্পণ করে সেটি রান্না করে ভোগে লাগাতে

বললেন। এমনি সময় আর এক ভক্ত দুধ নিয়ে আসেন। শচীমাতা তখন দুধ ও লাউ দ্বারা হালুয়া তৈরী করে ঠাকুরকে ভোগ দেন। তারপর ঐ ভোগ শ্রী গৌরের হাতে এনে দিলেন। তখন গৌরসুন্দর ঐ প্রসাদ নিজের হাতে ভক্তগণকে প্রদানের পর নিজে গ্রহন করেন। এভাবে অনেক সময় বিভিন্নভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীধর ঠাকুরকে কৃপা করেন।

সন্যাস গ্রহনের পর মহাপ্রভু যখন পুরীতে অবস্থান করতেন তখন গৌড়ীয় ভক্তগণের সাথে প্রতি বছর শ্রীধরও প্রভুকে দর্শন করার জন্য সেখানে যেতেন।

সুদাম ⇒ সুন্দরানন্দ ঠাকুর

ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের যিনি সুদাম সখা ছিলেন গৌরাঙ্গ লীলায় তিনিই সুন্দরানন্দ ঠাকুর হিসাবে আবির্ভূত হন।

গৌরগনোদ্দেশ দিপীকা গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ **"পুরা সুদাম নামাসীদদ্য ঠক্কুর সুন্দর।"** শ্রী সুন্দরানন্দ ঠাকুর নিত্যানন্দ শাখার অর্ন্তগত এবং প্রভুর অন্তরঙ্গ পারিষদ ছিলেন।

প্রেমরস সমুদ্র সুন্দরানন্দ নাম
নিত্যানন্দ -স্বরূপের পার্ষদ প্রধান॥"
(চৈ. ভাগবত অন্ত্য -৬)।

শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে ঃ

সুন্দরানন্দ –নিত্যানন্দের শাখা ভৃত্য।
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজ নর্ম॥"
(চৈ.চ. আদি ১১/২৩)।

শ্রী সুন্দরানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাট (বাসস্থান) যশোর জেলার মহেশপুর গ্রামে ছিল। (মতান্তরে একই জেলার বোধখানায়)।

"হলদা মহেশপুরে সুন্দরানন্দের বাস।
সুন্দরানন্দ পূর্বে সুদাম জানিবে নিশ্চয়॥"
(পাট পর্যটন)।

বর্তমানে মহেশপুর গ্রামে প্রাচীন স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে সুন্দরানন্দের জন্মভিটা ব্যতীত আর কিছুই নেই। শ্রী সুন্দরানন্দ ঠাকুর নিজে বিবাহ করেন নাই। এজন্য তাঁর নিজের কোন বংশধর নেই। তবে জ্ঞাতি ভাই এবং সেবায়েত শিষ্য বংশ বর্তমানে রয়েছেন।

শ্রী সুন্দরানন্দ ঠাকুর প্রায়শ কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়াল হয়ে যেতেন। কথিত আছে তিনি প্রেমের উন্মাদে এক সময় জল থেকে কুমীর পর্যন্ত ধরে এনেছিলেন। আবার

এক সময় জাম্বুরা গাছে তিনি অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করে কদম ফুল ফুটিয়ে ছিলেন।

"সুন্দরানন্দ ঠাকুর বন্দিব বড় আশে।
ফুটাল কদমফুল জাম্বিরের গাছে॥"
(শ্রী বৈষ্ণব বন্দনা)।

সুন্দরানন্দ ঠাকুরের অপ্রকট বছর জানা যায় না। তবে কোন এক কার্ত্তিক মাসের পূর্নিমা তিথিতে তিনি অপ্রকট হয়েছিলেন।

দাম ⇒ পুরুষোত্তম নাগর

ব্রজলীলায় যিনি শ্রীকৃষ্ণের সখা দাম গোপাল ছিলেন তিনিই গৌরাঙ্গ লীলায় পুরুষোত্তম নাগর হিসাবে আবির্ভূত হন। কেউ কেউ বলেন নাগর তাঁর উপাধি। আসল নাম নাকি পুরুষোত্তম দাস। নাগর উপাধি পাওয়ার পর তার নাম হয় পুরুষোত্তম দাস নাগর। নাগর দেশে পূর্ব বসতি ছিল বলে কারোও মতে তার উপাধি নাগর হয়। কথিত আছে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ অবস্থায় তিনি সর্পবিষ ভক্ষন করেছিলেন। কিন্তু এতে তার কোন অনিষ্ট হয় নাই।

অন্য মতে পুরুষোত্তম ঈশান নাগরের বড় ছেলে ছিলেন। তারা পদ্মা নদীর পূর্ব তীরে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার তেওথা ঝাঁক পাল গ্রামে বসবাস করতেন। এই গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে লিহানপুর গ্রামের পরই হুড়াসাগর ছিল। উত্তর দিক থেকে বাইশ কোদালিয়া নদী ও পশ্চিম দিক হতে পদ্মা নদী এসে এই হুড়াসাগরে মিলিত হয়। পুরুষোত্তম প্রতিদিন এই স্থানে আহ্নিক করতেন। একদিন স্থানের পর তিনি নিবিষ্ট মনে আহ্নিক করছিলেন। এমন সময় পানসী এবং বজরা নৌকার মাল্লারা গুনের (নৌকা টানার এক ধরনের মোটা দড়ি) সাহায্যে উত্তর দিকে নৌকা বেয়ে যাচ্ছিল। বড় লোকের নৌকার মাঝি-মাল্লারা নিরীহ বৈষ্ণব পুরুষোত্তমের দিকে লক্ষ্য না করেই নৌকা চালাচ্ছিল। কিন্তু যে সব মাল্লা গুন টানছিল বৈষ্ণবের আলৌকিক শক্তিতে তাদের পা চলা বন্ধ হয়ে যায়। নৌকায় যে ধনী লোক ছিলেন তিনি তখন বৈষ্ণবের শক্তি পরীক্ষার জন্য নৌকা থেকে মাঝিদেরকে এক খানা তিন হাত লম্বা ও আড়াই হাত প্রস্থ পাথর নদীতে ফেলে দিতে বললেন। উক্ত পাথর ধরাধরি করে জলে ছেড়ে দিয়ে বলল দেখি বৈষ্ণবের ইচ্ছায় এই পাথর জলে ভাসে কিনা। পুরুষোত্তম ঐ ধনী লোক ও মাঝিদের এই কার্যক্রম দেখে হুঙ্কার দিয়ে উঠেন। আর তার ফলে ঐ পাথর জলে ভাসতে ভাসতে তাঁর নিকট এসে পরে। পুরুষোত্তম পাথরটিকে ভক্তিভাবে স্পর্শ ও প্রনাম করে মাথায় নিয়ে বাড়ী চলে আসেন। তারপর এটিকে নিজের প্রতিষ্ঠিত শ্রী জগন্নাথদেবের সিংহাসনের এক পাশে রেখে সেবা পুজা করতে আরম্ভ করেন। প্রবাদ আছে যে তাঁর তিরোভাবের পর

বংশধরদের মধ্যে বিবাদ হওয়ায় ঐ পাথরটিকে খন্ড করার জন্য করাত দ্বারা চিরতে গেলে তা থেকে রক্ত বের হতে থাকে। তখন তারা পাথরটিকে বিভক্ত করা থেকে বিরত হন। পরবর্তীতে তার বংশধরগণের মধ্যে কেউ শ্রী জগন্নাথদেবের সেবার অধিকার পান, কেউ পান ঐ পাথর-সেবার ভার। বামন্দী গ্রামে ঐ পাথর নাকি এখনও সেবিত হচ্ছেন।

প্রবল ⟹ হলায়ুধ ঠাকুর (পণ্ডিত)

অনন্ত সংহিতা গ্রন্থ অনুযায়ী তিনি শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর পারিষদ এবং দ্বাদশ গোপালের প্রথম গোপাল। আবার **বৈষ্ণবাচার দর্পণ** গ্রন্থ মতে ইনি উপগোপাল। কেউ কেউ বলেন পূর্বলীলায় (ব্রজলীলায়) তিনি দ্বিতীয় সুবল গোপাল ছিলেন। অন্যদের মতে তিনি প্রবল গোপাল এবং বীরবাহু সখা।

গৌরগনোদ্দেশ দীপিকায় বলা হয়েছে ঃ **"সখঃ কশ্চিৎ প্রবলো গোপবালকঃ। আসীদ্ব্রজে পুরা যোহদ্য হলায়ুধ-ঠক্কুরঃ॥**

"সুবল গোপাল ব্রজে বলরাম-সখা।
ত্রবে হলায়ুধ পন্ডিত নামে -লেখা॥
কৃষ্ণ সেবা করি যেহোঁ বিষয় কৈল দূর।
চৈতন্যের শাখা বাস-রামচন্দ্রপুর॥"

শ্রী নবদ্বীপ-ধামে গঙ্গার উত্তর-পশ্চিমতীরে রামচন্দ্রপুর গ্রামে হলায়ুধ ঠাকুরের বাসস্থান ছিল। বর্তমানে প্রাচীন রামচন্দ্রপুর গ্রাম আর নেই। এটি গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। বর্তমানকালের রামচন্দ্রপুর গ্রাম ১০০/১২৫ বছর পূর্বের গ্রাম মাত্র। ঐ রামচন্দ্রপুর গ্রামেই দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ সুরম্য মন্দির নির্মাণ করে সেখানে শ্রী রাধা-বল্লভ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত মন্দির বর্তমানে পরিদৃষ্ট হয় না। স্থানীয় লোকদের ধারনা ঐ মন্দির সেখানকার মাটীর তলে চাপা পরে গিয়েছে।

দ্বিতীয় অংশ ঃ চৌষট্টি মহান্ত

মহান্ত শব্দের অর্থ

সন্ধিবিচ্ছেদ থেকে মহৎ+অন্ত = মহান্ত শব্দটি পাওয়া যায়। তাই যার অন্তকরণ মহৎ তাকে সাধারণ অর্থে মহান্ত বলা যায়। বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুযায়ী (চৈ. চ. আদি ১০/৪) অবশ্য যিনি মহাভাগবত এবং কৃষ্ণ ভক্ত তাকেই মহান্ত নামে অভিহিত করা যায়। ব্রজলীলায় শ্রীমতি রাধার আটজন প্রধান সখী ছিলেন। এদেরকে অষ্ট প্রধান মহান্ত বলা যায়। এই অষ্ট সখীর প্রত্যেকের অধীনে আবার আট জন করে অনুগত সখী ছিল। এভাবে প্রধান অষ্ট সখীর অনুগত যে ৬৪ জন সখী দেখা যায় ব্রজলীলায় তাদেরকেই চৌষট্টি মহান্ত বলা হয়।

আবার গৌরাঙ্গ লীলায় শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রী অদ্বৈত প্রভুর অনুগত আটজন মহাজন দেখা যায়। এদেরকে গৌড়লীলায় অষ্ট প্রধান মহান্ত বলা হয়। এই আটজনের মধ্যে প্রতিজনের আবার আটজন করে অনুগত শিষ্য-প্রশিষ্য রয়েছে। তাই গৌড়লীলায়ও চৌষট্টি জন মহান্তের বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। গৌরগনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থ অনুযায়ী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভারতের দাক্ষিনাত্য ভ্রমণকালে যারা তাঁর সঙ্গলাভ করেছিলেন সে সব বৈষ্ণবগণই মহান্ত নামে অভিহিত।

ব্রজ লীলার অষ্ট প্রধান এবং চৌষট্টি সখী (মহান্ত)

শ্রীমতি রাধিকার অষ্ট সখীর পরিচয়

শ্রীমতি রাধিকা হলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেয়সী। তাঁর অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় হল ঃ পিতা ⇒ বৃষভানু রাজা, মাতা ⇒ কলাবতী, ভাই ⇒ শ্রীদাম, ভগিনী ⇒ অনঙ্গমঞ্জরী, পতি ⇒ অভিমন্যু, শ্বশুর ⇒ বৃক, শাশুড়ী ⇒ জটীলা, ননদ ⇒ কুটীলা; বর্ণ ⇒ গলিত স্বর্ণবৎ পীতবর্ণ এবং বসন ⇒ নীল।

শ্রীমতি রাধিকার আটজন প্রধানা সখী রয়েছেন। তাঁরা হলেন নিম্নরূপ ঃ

(১) ললিতা দেবী (২) বিশাখা দেবী (৩) চম্পকলতা দেবী (৪) তুঙ্গবিদ্যা দেবী (৫) রঙ্গদেবী (৬) সুদেবী দেবী (৭) ইন্দুলেখা দেবী এবং (৮) চিত্রাদেবী। এই অষ্ট সখীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে বর্ণনা করা হলো।

১. শ্রীমতি ললিতা দেবী রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থ অনুযায়ী ললিতা দেবী হলেন শ্রীমতি রাধিকার প্রথমা এবং বরীয়সী সখী। তিঁনি শ্রীমতি রাধিকার চেয়ে ২৭ দিনের বড়/জ্যেষ্ঠা। ললিতার অপর নাম হল অনুরাধা। এঁর মাতার নাম ⇒ সারদী, পিতা ⇒ বিশোক, পতি ⇒ গোবর্ধন-সখা ভৈরব। তাঁর স্বভাব ⇒ বামা প্রখরা, অঙ্গকান্তি ⇒ গোরোচনার মতো, বস্ত্র ⇒ ময়ূরপুচ্ছের ন্যায়।

সঙ্গীত রত্নাকর গ্রন্থ অনুযায়ী শ্রীমতি ললিতার দৃষ্টি মধুর, কুঞ্চিতাপাঙ্গ, ভ্রূপেক্ষযুক্ত, মৃদুছন্দ, হাস্যশোভিত এবং কামোদ্দীপিত।

শ্রীমতি ললিতা দেবীর কুঞ্জে (যুথ বলা হয়) আবার তাঁর আটজন সখী আছেন ঃ রত্নপ্রভা, রতিকলা, সুভদ্রা, ভদ্ররেখিকা, সুমুখী, ধনিষ্ঠা, কলহংসী এবং কলাপিনী। এই অষ্ট সখী ললিতার আনুগত্যে অবস্থান করে রাধা-কৃষ্ণের সেবায় সতত নিয়োজিত রয়েছেন।

শ্রীমতি ললিতা হলেন রাধিকার পরমশ্রেষ্ঠ সখীগণের মধ্যে অগ্রণী এবং সবার নেত্রী। প্রেম সম্পর্কিত বিষয়াদির ক্ষেত্রে সর্বভাব সম্পর্কে অভিজ্ঞা এবং সন্ধি ও বিগ্রহনীতিতে সর্ববিশারদা। শ্রীমতি রাধিকার কাছে কোন সময় কৃষ্ণ অপরাধ করলে তাঁর প্রতি ললিতা ক্রোধে মুখ উত্তোলিত করেন। কৃষ্ণের সাথে সন্ধিকালে তিঁনি উদাসীনের মতো থেকে অথবা নিরপেক্ষতার ভান করে পৌর্ণমাসী দ্বারা যুক্তির বিধানে সন্ধি স্থাপন করিয়ে দেন। পুষ্পময় ভূষণ, ছত্র (ছাতা), শয্যা এবং গৃহাদি নির্মাণে তিঁনি অভিজ্ঞ। এছাড়া ইন্দ্রজাল বিদ্যা এবং প্রহেলিকা সৃষ্টিতেও ললিতা পারদর্শিনী।

শ্রী রাঁধা-কৃষ্ণের তাম্বুল সেবায় যে সব দাসী নিযুক্ত আছেন, ফুল, লতা, তাম্বুল লতা, গুবাক বৃক্ষাদির (সুপারি বৃক্ষ) অধিকারে যে সকল সখী অথবা বনদাসী নিযুক্ত আছেন এবং উৎকৃষ্ট পুষ্পমালা গাঁথতে পারদর্শী যেসব কন্যা রয়েছে, ললিতা তাদের সকলের নেত্রী বা পরিচালিকা হিসাবে প্রধান ভূমিকা পালন করেন।

উল্লেখ্য যে শ্রীমতি ললিতার মধ্যে **"খণ্ডিতা ভাব"** পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব-সঙ্কেতিত আগমন-কাল অতিক্রম করে নায়ক (এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং) অন্য নায়িকার/সখীর সাথে রাত্রিযাপন করত প্রাতঃকালে রতিচিহ্ন সহ যে নায়িকার নিকট আগমন করেন–তিনিই হলেন খণ্ডিতা। এ অবস্থায় খণ্ডিতার পক্ষে রোষ (রাগ) প্রকাশ, গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ এবং বিরাগ ভিত্তিক কথাবার্তা পরিলক্ষিত হয়।

২. শ্রীমতি বিশাখা দেবী শ্রীমতি রাধিকার অষ্ট সখীর দ্বিতীয়া। শ্রী রাধার জন্মক্ষণেই এঁরও জন্ম। তিঁনি আচার এবং ব্রত নিষ্ঠার দিক থেকে রাধিকার

সমতুল্য। বিশাখা দেবীর অঙ্গকান্তি বিদ্যুৎ বর্ণের ন্যায়, বস্ত্রাদি নক্ষত্রাবলির মতো। তাঁর পিতার নাম পাবন, মাতা হলেন জটীলার ভাগিনেয়ী দক্ষিণা, পতি-বাহিক।

শ্রীমতি বিশাখার কুঞ্জে (যুথে) মাধবী, মালতী, চন্দ্ররেখিকা, কুঞ্জরী, হরিণী, চপলা, সুরভি এবং শুভনীনা নামে অষ্ট সখী রয়েছে। এঁদের সবাইকে নিয়ে তিঁনি রাধাকৃষ্ণের নিত্যসেবায় নিয়োজিত।

শ্রীমতি বিশাখা রাধিকার প্রিয়নর্ম সখী, মঙ্গলময়ী, সূক্ষ্মমন্ত্রনায় পারদর্শী, দ্যূতক্রিয়া নিপুণা, বুদ্ধি সহকারে দৌত্যে পণ্ডিতা, কন্দর্পকার্যের সাম, দান এবং ভেদ নীতিতে বুৎপত্তিসম্পন্না। এছাড়াও পত্রাদি, পুষ্পমালা, ও বিভিন্ন ধরনের মণ্ডল অংকনে পারদর্শী। আবার সূর্য্য-আরাধনা সামগ্রি সংগ্রহ এবং ধ্রুপদ-গীতে তিঁনি বিচক্ষণা। চিত্র বিদ্যায় নিপুণা যে সব সখী আছেন, বস্ত্রাধিকারে যে সব সখী বা দাসী রয়েছেন, সর্বদা চমৎকার আনন্দ বিধানের জন্য যেসব বনদেবী আছেন, যাঁরা পুষ্পবৃক্ষের মালিকানা লাভ করেছেন– তাঁদের সবার অধ্যক্ষা হলেন এই বিশাখা দেবী।

উল্লেখ্য সখী ভাবের দিক থেকে বিশাখা দেবী হলেন **"স্বাধীন ভর্ত্তৃকা"**। কান্ত (স্বামী/প্রভু) যার অধীন হয়ে সমীপে (নিকটে) থাকেন তাঁকে স্বাধীন ভর্ত্তৃকা নায়িকা বলা হয়। এক্ষেত্রে জলকেলি, বনবিহার ইত্যাদি নায়িকার আদেশে নায়ক–কৃত মণ্ডলাদি এবং কুসুম-চয়নাদি লীলা প্রকটিত হয়।

৩. শ্রীমতি চম্পকলতা দেবী রাধিকার অষ্ট সখীর মধ্যে তৃতীয়া। অঙ্গের বর্ণ প্রস্ফুটিত চম্পা ফুলের ন্যায়। শ্রীমতি রাধিকার একদিনের ছোট। তাঁর বস্ত্র চানপক্ষীর (স্বর্ণ চড়াই পক্ষী) তুল্য। পিতার নাম⟹আরাম, মাতা হলেন⟹বাটিকা, পতি⟹চণ্ডাক্ষ। চম্পকলতা গুণের দিক থেকে বিশাখা-সদৃশ।

চম্পকলতার কুঞ্জে কুরঙ্গাক্ষী, সুচরিতা, মণ্ডলী, মণিকুণ্ডলা, চন্দ্রিকা, চন্দ্রলতিকা, কন্দুকাক্ষী এবং সুমন্দিরা নামে আটজন সখী রয়েছেন যাঁরা তাঁর নেতৃত্বে রাধাকৃষ্ণের নিয়ত সেবায় নিয়োজিত।

শ্রীমতি চম্পকলতা রাধিকার প্রিয়নর্ম সখী। তিনি দূত্য-তন্ত্রশাস্ত্রে অভিজ্ঞা, কাজের উদ্দেশ্য গোপন রাখতে পারদর্শী, বাক্যালাপে পটু, বিভিন্ন উপায়ে এবং নিপুণতার সাথে বিপক্ষকে হারিয়ে দিতে সক্ষম। এছাড়াও ইঁনি ফল, পুষ্প এবং কন্দাদির সন্ধান প্রক্রিয়ায়, বিভিন্ন ধরনের অতি সুন্দর মাটীর পাত্র নির্মাণ, ছয় ধরনের রস পরীক্ষায় ও রন্ধন শাস্ত্রে পারদর্শী এবং মিছরীর বিভিন্ন খাদ্য নির্মাণে মিষ্টহস্তা।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে বিভিন্ন ধরনের দুগ্ধাদি পাকে যে সব সখী ও দাসী আছেন, কুরঙ্গাক্ষী প্রভৃতি যে অষ্ট সখী আছেন, এবং যে সকল সখী বৃক্ষ-লতার অধিকারে নিযুক্ত আছেন, তাঁদের সবার অধ্যক্ষা/পরিচালিকা হলেন শ্রীমতি চম্পকলতা।

উল্লেখ্য যে সখীভাবের দিক থেকে চম্পকলতা হলেন "বাসকসজ্জা"। যে নায়িকা কান্তের (শ্রীকৃষ্ণের) ইচ্ছাবশতঃ কুঞ্জে অবস্থান করত তাঁর আগমন প্রতীক্ষায় নিজের দেহ এবং গৃহ/বাসর সুসজ্জিত করে রাখেন– তিনিই বাসকসজ্জা। এ অবস্থায় কামক্রীড়া-সঙ্কল্প, কান্তের আগমন পথ নিরীক্ষণ, সখীসহ বিনোদবার্ত্তা এবং ক্ষণে-ক্ষণে দূতীর প্রতি নিরীক্ষণ ইত্যাদি প্রকাশ পায়।

৪. শ্রীমতি সুচিত্রা দেবী রাধিকার অষ্ট সখীর মধ্যে চতুর্থ সখী। তিঁনি শ্রীমতি রাধিকার চেয়ে ২৬ দিনের ছোট। গাত্রবর্ণ কাশ্মীরবৎ গৌর এবং বস্ত্র কাঁচের ন্যায় বর্ণযুক্ত। তাঁর পিতার নাম চতুর (বৃষভানু রাজার কাকা/ পিতৃব্য), মাতা-চর্চিকা এবং স্বামী-পীঠর। এঁর কুঞ্জে রসোল্লাসা, তিলকিনী, শৌরসেনী, সুগন্ধিকা, রমিলা (রামিনী), কামনাগরী, নাগরী এবং নাগবেলিকা–এই অষ্ট সখী রয়েছেন।

শ্রীমতি সুচিত্রা দেবী সর্বত্র প্রবেশ করতে পারেন– অভিসারে, ইঙ্গিত বিজ্ঞানে, বিভিন্ন দেশীয় ভাষায়, দৃষ্টিমাত্র মধু-ক্ষিরাদী ইত্যাদি বস্তুর গুণাগুণ পরীক্ষায়, কাঁচপাত্র গঠনে, সর্পমন্ত্রে, জ্যোতিষ শাস্ত্রে, পশু-পরিচর্যায়, ঔষধাদি প্রয়োগে, মারণ-উচাটন বিদ্যায়, বৃক্ষোপচার শাস্ত্রে এবং বিবিধ পানক-নির্মাণে ইনি সবিশেষ পটু। রসোল্লাসাসহ অষ্ট সখী, পেয়াধিকারিণী সখী ও দাসীগণ এবং দিব্য ঔষধিগণের, বনস্থলীসমূহের এবং লতাবলীর অধিকারিণী সখী বা দাসীদের অধ্যক্ষা হলেন সূচিত্রা দেবী।

সখীভাব বিবেচনা করলে চিত্রাদেবী হলেন "দিবা অভিসারিকা"।

৫. শ্রীমতি তুঙ্গবিদ্যা শ্রীমতি রাধিকার অষ্ট সখীর মধ্যে পঞ্চম সখী। বয়সে রাধার চেয়ে পাঁচদিনের বড়। কর্পুর এবং চন্দন মিশ্রিত আলতার ন্যায় তাঁর গাত্রবর্ণ–অর্থাৎ এক কথায় চন্দ্রকুমারের ন্যায় তাঁর অঙ্গকান্তি। বস্ত্র এবং অলঙ্কার হল পাণ্ডুবর্ণের মতো। তাঁর স্বভাব দক্ষিণা-প্রখরা।

শ্রীমতি তুঙ্গবিদ্যার মাতার নাম⇒মেধা, পিতা⇒পুষ্কর এবং পতি হলেন বালিশ। তিনি রাধিকার অন্যতম প্রিয়নর্ম সখী। তাঁর কুঞ্জে মঞ্জুমেধা, সুমধুরা, সুমধ্যা, মধুরেক্ষণা, তনুমধ্যা, মধুস্যন্দা, গুণচূড়া এবং বরাঙ্গদা নামে অষ্ট সখী বিরাজমান।

শ্রীমতি তুঙ্গবিদ্যা অষ্টাদশ বিদ্যায় পারদর্শিনী, সন্ধি বিষয়ে কুশলা এবং শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বাসভাজন, রসশাস্ত্রে, নীতি শাস্ত্রে, নাট্যবিদ্যায়, নাটক এবং

আখ্যানাদি-রচনায় এবং সব ধরনের সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশারদ। দেবতা এবং ঋষিগণ প্রণীত তৌর্যত্রিক বিদ্যায় এবং বীনাবাদনে তিঁনি বিশেষ অভিজ্ঞা।

মঞ্জু-মেধাদি অষ্ট সখী, সন্ধিকুশলা সখীগণ, সঙ্গীত, কলাবতী ও নর্তকী প্রমুখা সখী এবং জলদেবীগণের অধ্যক্ষা এই তুঙ্গবিদ্যা দেবী।

সখীভাব বিবেচনা করলে তুঙ্গবিদ্যা হলেন বিপ্রলব্ধা। সংকেত করা সত্ত্বেও যদি প্রাণনাথ কখনো আগমন না করতে পারেন, তবে যে নায়িকা অত্যন্ত ব্যথিত হন তিনিই বিপ্রলব্ধা। অর্থাৎ কান্ত কর্তৃক অন্য কারণে বঞ্চিতা নারীকেই বিপ্রলব্ধা বলা হয়। এক্ষেত্রে নায়িকার বেলায় নির্বেদ, চিন্তা, খেদ, অশ্রুপাত, মূর্চ্ছা, দীর্ঘনিঃশ্বাস ইত্যাদি প্রকাশ পায়।

৬. শ্রীমতি ইন্দুলেখা দেবী শ্রীমতি রাধিকার অষ্ট সখীর ষষ্ঠ সখী। তাঁর বর্ন হরিতালবৎ উজ্জ্বল এবং বর্ণ দাঁড়িম্ব ফুলের মতো। তিঁনি রাধিকার চেয়ে তিন দিনের ছোট। মাতার নাম বেলা, পিতা ⇒ সাগর, পতির নাম দুর্বল। তাঁর স্বভাব বামা-প্রখরা। তিঁনি শ্রী রাধার প্রিয়নর্ম সখী।

ইন্দুলেখা দেবীর কুঞ্জে তুঙ্গভদ্রা, রসতুঙ্গা, রঙ্গবাটী, সুমঙ্গলা, চিত্ররেখা, চিত্রাঙ্গী, মেদেনী এবং মদনালসা– এই অষ্ট সখী বিরাজমান। এরা সবাই ইন্দুলেখার নেতৃত্বে রাধাকৃষ্ণের সেবায় নিয়ত নিযুক্ত রয়েছেন।

ইন্দুলেখা দেবী আগম এবং তন্ত্রোক্ত শাস্ত্রে পারদর্শী, দন্তরঞ্জন কাজে, বিবিধ রত্ন পরীক্ষায়, পট্টডোর-নির্মাণে এবং সৌভাগ্য যন্ত্রের লিখনে বুৎপন্না। তুঙ্গভদ্রাদি অষ্ট সখী তাঁর অনুগত। অলঙ্কারে, বেশে, কেশরক্ষণে এবং বৃন্দাবনস্থিত লীলাভূমির অধিকারে যে সব সখী ও দাসীগণ নিযুক্ত আছেন তাঁদের অধ্যক্ষা হলেন এই ইন্দুলেখা দেবী।

সখীভাব বিবেচনায় ইন্দুলেখা দেবী হলেন **"প্রোষিত ভর্ত্তৃকা"**। অর্থাৎ যে নায়িকার কান্তা দূর দেশে (দ্বারকায় বা মথুরায়) গিয়েছেন তিনিই প্রোষিত ভর্ত্তৃকা। এক্ষেত্রে প্রিয়সংকীর্তন, দৈন্য, কৃশতা, জাগরণ, মালিন্য, অস্বাস্থ্য, জাড্য এবং বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ও অনুভব পরিলক্ষিত হয়। হাস্য-পরিহাস, পরগৃহে গমন, উৎসব দর্শন, ক্রীড়া ও নারীর সংস্কার (শরীরের যত্নাদি) এরূপ নায়িকা বর্জন করেন।

৭. শ্রীমতি রঙ্গদেবী শ্রীমতি রাধিকার অষ্ট সখীর সপ্তম সখী। এঁর অঙ্গকান্তি পদ্মের কেশরের ন্যায়, বস্ত্র জবাকুসুমের মতো। তিঁনি রাধিকা থেকে সাতদিনের ছোট। তাঁর পিতার নাম রঙ্গসার, মাতা⇒করুণা, পতি⇒বক্রেক্ষণ (ভৈরবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা)। রঙ্গদেবী এবং সুদেবী যমজ ভগ্নী। তিঁনি রাধিকার প্রিয়নর্ম সখী।

শ্রীমতি রঙ্গদেবীর কুঞ্জে কলকণ্ঠী, শশিকলা, কমলা, মধুরা, ইন্দিরা, কন্দর্পসুন্দরী, কামলতিকা এবং প্রেমমঞ্জরী—এই অষ্ট সখী রয়েছেন।

রঙ্গদেবী সদাসর্বদা হাস্যরঙ্গ এবং কৌতুকপ্রিয়। কখনো কখনো শ্রীকৃষ্ণের অগ্রেও শ্রীমতি রাধাকে পরিহাস করত কৌতুক করেন। ষড়গুনের চতুর্থ বিষয়ে (আসন) যুক্তিকারিনী। পূর্বে তপস্যা করে শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ-মন্ত্র প্রাপ্ত হয়েছেন।

বিচিত্র অঙ্গরাগ নির্মাণে এবং গন্ধলেপনাদি কার্যে নিযুক্ত সখীগণ, কলকণ্ঠী প্রমুখ অষ্ট সখী এবং যেসব সখী এবং দাসী ধূপদান কাজে, শীতকালে অঙ্গারধারণে, গ্রীষ্মে ব্যজনে এবং বন্য বা গৃহপালিত পশু-পক্ষী ইত্যাদির অধিকারে নিযুক্ত আছেন—তাঁদের সবার নেত্রী হলেন এই রঙ্গদেবী।

সখীভাব বিবেচনা করলে তাঁকে **"উৎকণ্ঠিতা"** বলা হয়। নিরপরাধ কান্তের আগমনে বিলম্ব হলে যে নায়িকা উৎসুক চিন্তা হন তাকে উৎকণ্ঠিতা বলা যায়। তিন সময়ে উৎকণ্ঠা হতে পারে ঃ (i) বাসক-সজ্জা অবস্থায়/দশায় (ii) মান বিরতিতে—অর্থাৎ কলহান্তরিতা অবস্থায়/দশায় এবং (iii) নায়ক-নায়িকার পরাধীনতাবশত সঙ্গম বাধায়। এতে হৃদয়ের তাপ, কম্প, হেতু-বিতর্ক, অরতি, বাষ্পমোচন এবং নিজের অবস্থা বর্ণনার ইচ্ছা প্রকাশ পায়।

৮. শ্রীমতি সুদেবী শ্রীমতি রাধিকার অষ্ট সখীর শেষ সখী। ইনি রঙ্গদেবীর যমজ ভগ্নী। অঙ্গকান্তি সুবর্ণের ন্যায়। তার পতি— রঙ্গদেবীর স্বামী বক্রেক্ষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিঁনি শ্রী রাধার অন্যতম প্রিয়নর্ম সখী। তাঁর বস্ত্র প্রবালের ন্যায়। শ্রীমতি সুদেবীর কুঞ্জে কাবেরী, চারুকবরা, সুকেশী, মঞ্জুকেশিকা, হারহীরা, মহাহীরা, হারকণ্ঠী এবং মনোহরা—এই অষ্ট সখী বিরাজমান।

সুদেবী শ্রীমতি রাধিকার কেশ পরিচর্যা, অঞ্জন প্রদান এবং অঙ্গসম্বাহন করতে সব সময়ই তাঁর পাশে অবস্থান করেন। শুক-শারীর শিক্ষায়, শুভাশুভ চিহ্ন নির্দেশে, পশু-পক্ষীর ভাষাজ্ঞান, চন্দ্রোদয়-মেঘ-বহ্নি বিদ্যা এবং শর্য্যারচনায় নিপুণা যে সব অষ্ট সখী নিযুক্ত আছেন, আসনের অধিকারে নিযুক্তা যে সব সখী ও দাসী, বিপক্ষীয়গণের মনোভাব এবং কলাকৌশল জানতে যে সব ধূর্ত নারী বিভিন্ন বেশে চারণ করেন, যারা বন্য ও গৃহপালিত পশু-পক্ষীর অধিকারে রয়েছেন, সে সব সখী এবং বন দেবীদের অধ্যক্ষা হলেন এই সুদেবী।

সখীভাবে সুদেবী হলেন **"কলহান্তরিতা"**। অর্থাৎ যে নায়িকা সখীদের সামনে পদাবনত কান্তকে ক্রোধে নিরসন করে পরবর্তী সময়ে অনুতাপ করেন। এক্ষেত্রে প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ইত্যাদি প্রকাশিত হয়।

পাঠকদের সুবিধার জন্য উপরে বর্ণিত অষ্ট সঙ্গীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিচে একটি টেবিলের সাহায্যে উপস্থাপন করা হল।

অষ্ট সখীর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী

সখীর নাম	বর্ণ	বস্ত্র	সেবা	ভাব	কুঞ্জ	বয়স (বছর, মাস, দিন)
১. ললিতা	গোরোচনা	ময়ূরপুচ্ছ	তাম্বুল	খণ্ডিতা	বিদ্যুৎ	১৪/২/১৪
২. বিশাখা	বিদ্যুৎ	তারাবর্ণী	কর্পূরাদি	স্বাধীন ভর্ত্তৃকা	মেঘবর্ণ	১৪/২/১৫
৩. চম্পকলতা	চম্পক	চানপক্ষীবর্ণ	চামর	বাসকসজ্জা	তপ্ত স্বর্ণবর্ণ	১৪/২/১২
৪. সুচিত্রা	কাশ্মীর	কাঁচপ্রভা	বস্ত্রালঙ্কার	দিবা অভিসারিকা	কিঞ্জলক বর্ণ	১৪/২/১৬
৫. তুঙ্গবিদ্যা	চন্দ্রকুমার	পাণ্ডুবর্ণ	গীতবাদ্য	বিপ্রলব্ধা	অরুণ বর্ণ	১৪/২/১৩
৬. ইন্দুলেখা	হরিতাল	দাড়িম্ব কুসুম	নৃত্য	প্রোষিত ভর্ত্তৃকা	স্বর্ণ বর্ণ	১৪/২/১৯
৭. রঙ্গদেবী	পদ্মরঞ্জক	জবাকুসুম	অলক্ত	উৎকণ্ঠিতা	শ্যামবর্ণ	১৪/৩/২০
৮. সুদেবী	সুবর্ণ	প্রবালবর্ণ	কেশ সংস্কার	কলহান্তরিতা	হরিৎবর্ণ	১৪/৩/২০

অষ্ট সখীর প্রণাম মন্ত্র

কারুণ্যবল্ললতিকে ললিতে নমস্তে।

রাধা-সমান গুণ চাতুরিকে বিশাখে।

তাং নৌমি চম্পকলতেহচ্যুতে চিত্ত চৌরে।

বন্দে বিচিত্র চরিতে সখি চিত্রলেখে।

শ্রীরঙ্গদেবী দয়িতে প্রণয়াঙ্গ রঙ্গে।

তুভ্যং নমোহস্তু সুখলাস্য সরিৎ সুদেবী।

বিদ্যাবিনোদ সদনেহসি তুঙ্গবিদ্যে।

পুর্নেন্দু খণ্ড নগরে সুসখী ইন্দুলেখে।

শ্রীগৌর লীলার অষ্ট প্রধান মহান্ত শ্রী গোপালগুরু গোস্বামী ব্রজলীলার অষ্ট প্রধান সখীর বিপরীতে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার যে অষ্ট প্রধান মহান্ত নির্ণয় করেছেন তা নিম্নরূপ।

ব্রজলীলার অষ্ট প্রধান সখী (প্রধান মহান্ত)	গৌড়লীলার অষ্ট প্রধান মহান্ত
১. ললিতা ⇒	স্বরূপ দামোদর।
২. বিশাখা ⇒	রামানন্দ রায় (রায় রামানন্দ)।
৩. সূচিত্রা ⇒	গোবিন্দানন্দ ঠাকুর।
৪. ইন্দু লেখা ⇒	রামানন্দ বসু।
৫. চম্পকলতা ⇒	শিবানন্দ সেন।
৬. রঙ্গদেবী ⇒	গোবিন্দ ঘোষ।
৭. তুঙ্গ বিদ্যা ⇒	বক্রেশ্বর পণ্ডিত।
৮. সুদেবী ⇒	বাসুদেব ঘোষ।

মতান্তরে তুঙ্গাবিদ্যার বিপরীতে মাধব ঘোষকে কেউ কেউ অন্যতম প্রধান মহান্ত রূপে নির্ণয় করেছেন।

উল্লেখ্য যে গৌরগনোদ্দেশ দিপীকা (গৌ.গ) এবং পাট পর্যটন (পা.প) গ্রন্থ অনুযায়ী নিম্নোক্ত তথ্য পওয়া যায়।

গৌড়লীলার পার্ষদ	ব্রজলীলার সখী
১. স্বরূপ দামোদর ⇒	ললিতা (গৌ.গ)।
২. রামানন্দ রায় ⇒	বিশাখা (গৌ.গ)।
৩. রামানন্দ বসু ⇒	কলকণ্ঠী (গৌ. গ)।
৪. শিবানন্দ সেন ⇒	বীরাদূতী (গৌ.গ) এবং সূচিত্রা (পা. প)
৫. গোবিন্দ ঘোষ ⇒	কলাবতী (গৌ.গ)।
৬. বক্রেশ্বর পণ্ডিত ⇒	শশিরেখা (গৌ. গ)।
৭. বাসুদেব ঘোষ ⇒	গুনতুঙ্গা (গৌ. গ)।
৮. রাঘব গোস্বামী ⇒	চম্পকলতা (গৌ. গ)।
৯. গদাধর ভট্ট ⇒	রঙ্গদেবী (গৌ. গ)।
১০. বনমালী কবিরাজ ⇒	সূচিত্রা (গৌ. গ)।
১১. প্রবোধানন্দ সরস্বতী ⇒	তুঙ্গবিদ্যা (গৌ. গ)।
১২. গোবিন্দানন্দ ঠাকুর ⇒	ইন্দুলেখা (গৌ. গ)।

এই বইতে আমরা শ্রী গোপালগুরু গোস্বামীপাদ এর মতকে প্রাধান্য দিয়ে **গৌরগনোদ্দেশ দিপীকা** -এর উপর ক্ষেত্র বিশেষে গুরুত্ব দিয়ে অষ্ট প্রধান সখীর বিপরীতে অষ্ট প্রধান মহান্ত এবং তাঁদের অনুগত চৌষট্টি মহান্তের বিষয়টি তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ যেখানে যে উৎসের কথিত মহান্তদের বিবরণ পেয়েছি তাই লিপিবদ্ধ করেছি।

১. ললিতা ⇒ স্বরূপ দামোদর আদি নাম পুরুষোত্তম আচার্য। ব্রজের ললিতা সখী। তাকে শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ বলা হয়।

"সবার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্মী দুইজন।
পরমানন্দ পুরী আর স্বরূপ দামোদর॥"
(চৈ.চ. আদি ১০/২৫)।

পিতার নাম ⇒ পদ্মগর্ভাচার্য এবং মাতামহের নাম ⇒ জয়রাম চক্রবর্তী। আদি নিবাস ⇒ ভিটাদিয়া। জয়রাম চক্রবর্তী নবদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। তিনি নিজের কন্যার সাথে পদ্মগর্ভাচার্যের বিবাহ দিয়ে তাকে নবদ্বীপে বাস করান। বিয়ের কিছুদিন পর এক ছেলে জন্ম গ্রহন করে। নাম রাখা হয় পুরুষোত্তম আচার্য।

পদ্মগর্ভাচার্য স্ত্রী এবং পুত্রকে শ্বশুড়ের গৃহে রেখে মিথিলা, কাশী ইত্যাদি স্থানে বেদ ও বেদান্ত পাঠের জন্য গমন করেন। পরে কাশীতে তার সাথে শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীর গুরুদেব শ্রী লক্ষ্মীপতির দেখা হয়। তিনি তখন শ্রী লক্ষ্মীপতির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে নিজের গৃহ ভিটা দিয়াতে এসে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। ঐ স্থানে দ্বিতীয়া পত্নী কমলার গর্ভে পুরুষোত্তম আচার্যের সৎ ভাই লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর জন্ম হয়।

পুরুষোত্তম আচার্য তখন মাতামহের নবদ্বীপের বাসভবনে লালিত-পালিত হতে থাকেন। পুরুষোত্তম তখন থেকেই মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। একসময় মহাপ্রভু সন্যাস গ্রহণ করে নদীয়া ত্যাগ করেন। ঐ সময় পুরুষোত্তমও আর নদীয়াতে থাকতে পারলেন না। তিনিও নবদ্বীপ ত্যাগ করে সন্যাস গ্রহণ করেন। তার সন্যাস নাম হয় স্বরূপ দামোদর।

"মাতাসহ পুরুষোত্তম হৈল নবদ্বীপবাসী।
চৈতন্যের প্রিয়ভক্ত হৈল গুনরাশি॥
চৈতন্যের সন্যাস দেখি পাগল হইয়া॥
সন্যাস গ্রহণ কৈল বারানসী গিয়া॥
সন্যাস-আশ্রমে নাম স্বরূপ দামোদর॥
প্রভুর অতি মর্মী ভক্ত রসের সাগর॥"
(শ্রী শ্যামলাল গোস্বামী ঃ প্রেম সম্পুটম্)।

স্বরূপ দামোদর কাশীধামে চৈতনানন্দ নামক এক সন্যাসীর নিকট কিছুদিন বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন করেছিলেন। কিন্তু ঐ সন্যাসী অত্যন্ত বেদান্তবাদী ছিলেন এবং মায়াবাদী দর্শন প্রচার করতেন। মায়াবাদী দর্শন শুনতে অনিচ্ছুক স্বরূপ দামোদর তাঁর কাছে না থাকতে পেরে পুরীধামে চলে যান। সেখানেই মহাপ্রভুর সাথে তার মিলন হয় এবং দীর্ঘদিন তিনি মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে থাকেন। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য লীলার অনেক স্থানেই স্বরূপ দামোদর পণ্ডিতের কথা বর্ণনা রয়েছে।

স্বরূপ দামোদর লোকজনের সাথে খুব কম কথা বলতেন। তিনি নির্জনে থাকতে ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচুদরের কৃষ্ণ রসের তত্ত্ব জ্ঞানী। দেহ ছিল প্রেমরূপ। তাঁকে সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ বলা হয়। মহাপ্রভুর মর্মী বা সাড়ে তিনজন ভক্ত ছিলেন (স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, শিখি মাহিতী এই তিনজন এবং শিখি মাহিতীর বোন মাধবী দেবী। স্ত্রীলোক বিধায় তাকে অর্দ্ধজন-এই সাড়ে তিন জন)।

স্বরূপ দামোদর প্রভু শ্রী পুন্ডরিক বিদ্যানিধির পূর্ব সখা ছিলেন। শ্রী পুন্ডরিক বিদ্যানিধি একবার শ্রী জগন্নাথদেবের মাভুয়া বস্ত্র (মাড় যুক্ত বস্ত্র) পরিধানে দোষারূপ করলে শ্রী জগন্নাথ ও বলরাম তাকে রাত্রে চপেটাঘাত (গালে আঘাত) করেন। বিদ্যানিধির এরূপ কৃপা প্রাপ্তি শ্রবণ করে স্বরূপ দামোদর আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন (চৈ. চ. অন্ত্য ১০/৮৬-১৭৫)।

শ্রী মন্ মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদরকে এতটাই গুরুত্ব দিতেন যে কেউ তার কাছে কোন গ্রন্থ, শ্লোক, গীত উপস্থাপন করলে স্বরূপকে তা পরীক্ষা করতে দিতেন। স্বরূপ দামোদর পরীক্ষা করার পর তা মহাপ্রভু শুনতেন। এজন্য যে সব গ্রন্থ, শ্লোক এবং গীত স্বরূপ দামোদর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভক্তিসিদ্ধান্ত এবং কৃষ্ণ প্রেমের বিরোধী মনে করতেন সে সব বাতিল করে দিতেন। মহাপ্রভু সেগুলো শুনতেন না। শুদ্ধ হলেই স্বরূপ দামোদর ঐ সব গ্রন্থ ও শ্লোক প্রভুকে শ্রবণ করাতেন, অন্যথায় নয়। স্বরূপ দামোদর বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস ও শ্রী গীতগোবিন্দ ইত্যাদি শ্রবন করিয়ে মহাপ্রভুকে আনন্দ দিতেন। স্বরূপ দামোদর সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। এছাড়া শাস্ত্র বিষয়ে তার অগাধ পান্ডিত্য ছিল। তিনি শ্রী অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দ প্রভুর পরম প্রিয় ছিলেন। (চৈ. চ. মধ্য ১০/১১০-১১৭)।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু দিবাভাগে সাধারন ভক্তদের সাথে নাম সংকীর্ত্তন করে কাটাতেন। রাতে শ্রী স্বরূপ দামোদর ও শ্রী রামানন্দ রায়ের সাথে রাধাকৃষ্ণ লীলারস আস্বাদন করতেন।

শ্রী গৌরসুন্দরের অন্ত্য লীলায় শ্রী স্বরূপ দামোদর প্রভু সব সময় তাঁর সাথে অবস্থান করতেন। শ্রী রঘুনাথ দাসকে মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদরের হাতে অর্পন করেছিলেন।

কোন এক আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রী স্বরূপ দামোদর গোস্বামী অপ্রকট হন।

২. বিশাখা ⇒ রামানন্দ রায় ব্রজলীলায় অষ্ট সখীর অন্যতম বিশাখা সখীই গৌরাঙ্গলীলায় শ্রী রামানন্দ রায়। কেউ কেউ বলেন যে পূর্বের ললিতা সখীও তার মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট। তবে এই মত সর্বসম্মত নয়। **গৌরগনোদ্দেশ দিপীকা গ্রন্থ** মতে তিনি পূর্বলীলায় বিশাখা সখী, পান্ডুপুত্র অর্জুন এবং প্রিয়নর্ম সখা অর্জুন ছিলেন (গৌরগনোদ্দেশ দীপিকা ১০২-১০৪)। পদ্মপুরান মতে অর্জুন গোপীদেহ লাভ করে অর্জুনীয়া নাম ধারন করেছিলেন। তাই রায় রামানন্দের মধ্যে সখা অর্জুন, পণ্ডিত অর্জুন, অর্জুনীয়া সখী প্রমুখের প্রবেশই স্বীকার্য **(দ্রষ্টব্য ঃ শ্রী শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৩৪৮)**।

শ্রী রামানন্দ রায়ের পিতার নাম ভবানন্দ রায় এবং মাতার নাম কুন্তিদেবী। শ্রী ভবানন্দ পূর্বে পান্ডুরাজ ছিলেন। তাঁর পাঁচ পুত্র ছিল ঃ রামানন্দ, গোপীনাথ, কলানিধি, সুধানিধি এবং বানীনাথ। শ্রী ভবানন্দ রায় এই পাঁচ পুত্রকেই মহাপ্রভুর শ্রী চরণে সমর্পন করেছিলেন।

শ্রী রামানন্দ রায় উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীন পূর্ব ও পশ্চিম গোদাবরীর বিশ্বস্ত শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় **জগন্নাথ বল্লভ** নামে একটি নাটক রচনা করেন। সেখানে তিনি রাজা প্রতাপরুদ্র ও নিজের পিতা ভবানন্দ রায়ের বিষয়ে লিখেন। ১৩০০ শকাব্দের (শক প্রজাতির রাজা শাকি বাহন কর্তৃক প্রবর্তিত সময়) শেষভাগে সম্ভবত উষিশ্যার কটক অঞ্চলে রায় রামানন্দের জন্ম হয়। শ্রী রামানন্দ রায়ের একজন বংশধর শ্রী মনোহর রায় **দিনমণি চন্দ্রোদয়** নামে একটি নাটক রচনা করেন। সেখানে পূর্ব পুরুষগনের পরিচয় এভাবে রয়েছে ঃ বানীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দের ভাই ছিলেন। বানীনাথের দুই ছেলে ছিল। তাদের নাম গোকুলানন্দ রায় এবং হরিহর রায়। হরিহর রায়ের এক পুত্র হয়। তার নাম গোবিন্দানন্দ। এই গোবিন্দানন্দের নিত্যানন্দ ও মনোহর নামে দুই ছেলে হয়। নিজের গ্রাম ছেড়ে গোবিন্দানন্দ কটক শহরে আগমন করেন। সেখানে তিনি এক বিস্তৃত জায়গা নিয়ে রাজধানী তৎকালীন সময়ে স্থাপন করেন। গোবিন্দানন্দের মৃত্যুর পর তৎকালীন উড়িষ্যার রাজা সাতখানা গ্রাম ছাড়া সব জায়গা দখল করে নেন।

পিতৃ বিয়োগ ও বিত্তনাশে দুঃখিত হয়ে মনোহরের ভাই নিত্যানন্দ নিজের পরিজনকে বিদ্যানগরের প্রাচীন বাড়ীতে রেখে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে আগমন

করেন। তিনি সেখানে বিষয়-কর্ম করতেন। এখানে এক বাস-ভবন নির্মান করেন ও প্রচুর সম্পত্তি অর্জন করেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন পুরী থেকে দাক্ষিনাত্যে যাত্রা করেন তখন শ্রী সার্বভৌম পণ্ডিত তাঁকে বিশেষভাবে নিবেদন করেন যে তিনি যেন শ্রী রামানন্দ রায়ের সাথে মিলিত হন। কারন হিসাবে বলেন রায় রামানন্দ একজন অতি রসিক ভক্ত।

"তোমার সঙ্গে যোগ্য তেঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তার সম।"
(চৈ. চ. মধ্য ৭/৬৪)।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে প্রেম বিতরণ করতে করতে এক সময় গোদাবরী নদীর পশ্চিম তীরে উপস্থিত হন। শ্রী সার্বভৌম পণ্ডিতের আবেদন মহাপ্রভুর মনে ছিল। রায় রামানন্দের সাথে তাঁর মিলিত হওয়ার বাসনা জাগে। শ্রী লোচন দাসের **চৈতন্য মঙ্গল** অনুসারে গোদাবরী নদীর তীরের কাঞ্চীনগরে মহাপ্রভুর সাথে রায় রামানন্দের সাক্ষাত হয়।

একদিন শ্রীমন্ মহাপ্রভু গোদাবরী নদীর তীরে একটি বট গাছের নীচে বসেছিলেন। এই সময় সামান্য দূরের রাজপথ দিয়ে রামানন্দ রায় স্নান করতে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে পাত্রমিত্র ও বৈদিক ব্রাহ্মণগণ। শ্রী রামানন্দ দূর থেকে গাছের নীচে উপবেশনরত দিব্য কান্তিময় এক সন্যাসীকে অবলোকন করেন। বৈদিক বিধান অনুযায়ী গোদাবরী নদীতে স্নান সমাপন করে তিনি মহাপ্রভুর কাছে উপস্থিত হলেন। একজন আরেকজনের প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। রায় রামানন্দ তখন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরনে দন্ডবৎ প্রনাম করেন। মহাপ্রভু তাকে ভূমি থেকে তুলে জিজ্ঞেস করেন যে সে রামানন্দ রায় কিনা। উত্তরে রামানন্দ রায় বলেন যে তিনি শূদ্রেরও অধম। বিনয়ে অবনত এই উত্তর শুনে মহাপ্রভু তাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করেন।

এরপর রামানন্দ রায় মহাপ্রভুকে সেখানে কিছু দিন থেকে তার মতো দীন-হীনজনকে উদ্ধারের জন্য প্রভুর কাছে আবেদন জানান। এই সময় একজন ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে তার গৃহে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য নিবেদন করলে তিনি সেখানে চলে যান। যাওয়ার সময় রামানন্দকে বলেন যে তিঁনি তার সাথে আবার মিলিত হবেন।

পরদিন শ্রীমন্ মহাপ্রভু অপরাহ্নে স্নানাদি সেরে গোদাবরী নদীর তীরের ঐ বটগাছের তলে উপবেশন করলেন। ঐ সময় রামানন্দ রায় কজন ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ সন্নিধানে আগমন করেন। রামানন্দ রায় দণ্ডবৎ প্রণাম করতেই মহাপ্রভু উঠে তাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করেন। এরপর উভয়ে প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে কৃষ্ণকথা আলাপ আরম্ভ করেন। এই সময়েই রামানন্দ রায়কে মহাপ্রভু সাধ্য-সাধন তত্ত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি প্রথমে বর্ণাশ্রম ধর্ম উল্লেখ করে ক্রমশ ভগবানে কর্ম অর্পণ, নিষ্কাম কর্ম, জ্ঞান মিশ্র, জ্ঞানশূন্য ও শুদ্ধ ভক্তির কথা বলেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু এগুলোর কোনটিকেই সাধ্য সাধন-সার বলে স্বীকার না করলে রায় রামানন্দ তখন একের পর এক শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের কথা বলেন। মহাপ্রভু তাঁকে আরোও বলার কথা বললে রায় রামানন্দ তখন মধুর রতির ব্রজগোপীদের কথা বলে শ্রীমতি রাধিকার অসাধারণ ভাবের কথা বলেন। তখন মহাপ্রভু একেই সাধ্যসাধন বলে স্বীকৃতি দিলেন।

পরদিন সন্ধ্যায় রামানন্দ রায় প্রভুর নিকটে এসে তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। প্রভু উঠে তাকে নিবিড় প্রণয়সহ আলিঙ্গন করলেন। তারপর মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, জীবের কীর্ত্তি, জীবের পরম ধর্ম, জীবের দুঃখ, মুক্ত জীব, জীবের করণীয় এবং ধ্যেয় বস্তু ও বাসস্থান, জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রবণ, কীর্ত্তন, ইত্যাদি কি এসব বিষয়ে প্রশ্ন করলে রায় রামানন্দ একের পর এক উত্তর দেন। অতি সন্তুষ্ট হয়ে করুণা করে শ্রীমন্ মহাপ্রভু তখন রামানন্দ রায়কে শ্রীকৃষ্ণের রসরাজ এবং শ্রীমতি রাধিকার মহাভাব-এই দুয়ের মিলিত স্বরূপ দেখান। এ দেখে রামানন্দ মূর্ছিত হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর চৈতন্য হলে তিনি প্রভুর বিভিন্ন স্তব-স্তুতি করতে থাকেন। মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে তাঁর স্বরূপের কথা গোপন রাখতে বলেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু বিদায় চাইলে রামানন্দ রায় প্রভুর চরণসেবার সুযোগ দানের জন্য নিবেদন করেন। প্রভু তাকে বিষয়াদি ত্যাগ করে নীলাচলে চলে আসার জন্য উপদেশ দেন। পরবর্তীতে রামানন্দ রায় রাজা প্রতাপরুদ্রের অনুমতি নিয়ে পুরীতে চলে আসেন।

পুরীতে অবস্থানকালীন সময়ে রামানন্দ রায় কৃষ্ণলীলা নাটক লিখে দেবদাসীদের দিয়ে তা শ্রী জগন্নাথদেবের সামনে অভিনয় করাতেন। তিনি সাধনমার্গের এতটা উচ্চস্তরে উঠেছিলেন যে সুন্দরী দেবদাসীদের দৈহিক স্পর্শেও তাঁর মনে কোন বিকার হতো না। শ্রী স্বরূপ দামোদর এবং শ্রী রামানন্দ রায় ছিলেন মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার সঙ্গী।

"রামানন্দের কৃষ্ণকথা স্বরূপের গান।
বিরহ বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ।"

(চৈ. চ. অন্ত্য ৬/৬)।

ভজন নির্ণয়ে উক্ত আছে যে রামানন্দ রায় রাঘবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ছিলেন।

"মাধবপুরীর শিষ্য-রাঘবেন্দ্রপুরী।
তাঁর শিষ্য রামানন্দ প্রেম অধিকারী।"

[দ্রষ্টব্যঃ শ্রী শ্রী গোড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৩৪৯)।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর শ্রী রামানন্দ রায় বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে অপ্রকট হন।

৩. সুচিত্রা ⇒ গোবিন্দানন্দ ঠাকুর

ব্রজলীলার শ্রীমতি রাধিকার অষ্ট সখীর অন্যতম সুচিত্রা গৌরাঙ্গ লীলায় গোবিন্দানন্দ ঠাকুর হিসাবে আবির্ভূত হন। তবে গৌর গণোদ্দেশ দিপীকা অনুযায়ী ব্রজলীলার সুচিত্রা হলেন গৌড়লীলার বনমালী কবিরাজ। আবার পাটপর্যটন অনুযায়ী পূর্বলীলায় গোবিন্দানন্দ ঠাকুর ইন্দুলেখা সখী ছিলেন। এতে তাঁর নাম ও ধাম আছে।

"কোঙর হট্টে গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের বাস।
ইন্দুলেখা সখী পূর্বে জানিবা নির্যাস॥"

৪. ইন্দুলেখা ⇒ রামানন্দ বসু

ব্রজলীলায় যিনি শ্রীমতি রাধিকার অষ্ট সখীর অন্যতম ইন্দুলেখা ছিলেন গৌরাঙ্গ লীলায় তিনি রামানন্দ বসু নামে আবির্ভূত হন। (অবশ্য গৌরগণোদ্দেশ দিপীকা অনুযায়ী রামানন্দ বসু ব্রজের কলকণ্ঠী সখী ছিলেন)। রামানন্দ বসু শ্রীচৈতন্য শাখার অর্ন্তগত। তিনি শ্রী মালাধর বসুর অধস্তন বংশধর ছিলেন। একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। তাঁর শ্রীপাট (বাসস্থান) কুলীন গ্রামে ছিল।

"কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ রামানন্দ।" (চৈ.চ. আদি ১০/৮০)।

তৎকালীন কুলীন গ্রামবাসীদের সবাই শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত ছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অতি প্রিয়পাত্র তারা ছিলেন। এদের ভক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে মহাপ্রভু বলেন–

'কুলীন গ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয়, অন্যজন রহ দূর॥"
(চৈ.চ আদি ১০/৮২)।

শ্রীমদ্ কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি–

"কুলীন গ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকরে চড়ায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায়॥"
(চৈ.চ. আদি ১০/৮৬)।

কুলীন গ্রামের মালাধর বসুর (গুণরাজ খান) পুত্র লক্ষ্মীনাথ (সত্যরাজ খান) এর পুত্র ছিলেন রামানন্দ বসু।

৫. চম্পকলতা ⟹ শিবানন্দ সেন

ব্রজলীলায় যিনি শ্রীমতি রাধিকার চম্পকলতা সখী ছিলেন গৌরাঙ্গ লীলায় তিনি শিবানন্দ সেন হিসাবে আবির্ভূত হন। তবে শ্রী কবি কর্ণপুর **গৌরগণোদ্দেশ দিপীকাতে** লিখেছেন ঃ যিনি ব্রজলীলায় বৃন্দাবনে বীরা নামে শ্রী রাধার দূতী-গোপী ছিলেন তিনিই অধুনা শ্রী শিবানন্দ সেন। আবার **পাট পর্যটন** অনুযায়ী ব্রজলীলার সূচিত্রা সখীই গৌড়লীলার শিবানন্দ সেন।

শ্রী শিবানন্দ সেন তৎকালীন সময়ের কুমারহট্ট, বর্তমানকালের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হালিশহরে বসবাস করতেন। শিবানন্দ সেন তার ভূসম্পত্তি থেকে অর্জিত আয়ের সিংহভাগ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এবং তাঁর ভক্তগণের সেবার জন্য ব্যবহার করতেন। তাঁর পুত্র, পরিজন এবং এমনকি ভৃত্যগণ সকলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন। শিবানন্দ সেনের তিন পুত্র (১) শ্রীচৈতন্য দাস (২) শ্রীরাম দাস এবং (৩) শ্রী কর্ণপুর মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। তার বোনের ছেলে শ্রী বল্লভ সেন ও শ্রীকান্ত সেনও বড় ভক্ত ছিলেন।

প্রতি বছর শ্রী শিবানন্দ সেন গৌড়ীয় ভক্তগণকে নিজের তত্ত্বাবধানে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য পুরীধামে নিয়ে যেতেন।

"শিবানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।
প্রভু স্থানে যাইতে সবে লয়েন যার সঙ্গ॥
প্রতিবর্ষে প্রভুগণে সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচলে চলেন পথে পালন করিয়া॥"
(চৈ. চ. আদি ১০/৫৪-৫৫)।

সাধারণত শিবানন্দ সেনের সাথে যেসব ভক্ত মহাপ্রভুকে প্রতি বছর দর্শনের জন্য পুরীধামে যেতেন তাদের মধ্যে শ্রী চন্দ্রশেখর আচার্য, পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি, শ্রীবাস পণ্ডিত ও তার ভ্রাতাগণ ও স্ত্রী, বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, মুরারী গুপ্ত, শ্রী রাঘব পণ্ডিত, শ্রীখণ্ড বাসী নরহরি, গুণরাজ খা প্রমুখ ছিলেন প্রধান। এছাড়া শিবানন্দ সেনের স্ত্রী এবং তিন পুত্রও সহগামী হতেন। ভক্তদের মধ্যে আবার অনেকে স্ত্রীকেও সঙ্গে নিতেন। এই যাত্রার সময় ভক্তদের স্ত্রীবৃন্দ মহাপ্রভুর রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের জিনিস তৈরি করে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সমস্ত অনুগামী ভক্তবৃন্দের খাবার-দাবার এবং নদী পারাপারের ঘাটের পয়সাকড়ি শিবানন্দ সেন নিজে বহন করতেন। শ্রী শিবানন্দ সেন উড়িষ্যার গ্রাম্য পথের সন্ধান জানতেন বলেই গৌড়ীয় ভক্তগণ তাঁর নেতৃত্বে পুরীতে প্রতি বছর গমন করতেন।

শ্রী শিবানন্দ সেন নিত্যানন্দ প্রভুরও পরম ভক্ত ছিলেন। একবার কোন এক কারণে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে পা দিয়ে প্রহার করেছিলেন। শিবানন্দ সেন একে প্রভুর

কৃপা বলে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন। এই কাহিনী হল ঃ একবার পুরীতে যাওয়ার পথে এক নদী পারাপারের পয়সাকড়ির হিসাব-নিকাশ করার জন্য শিবানন্দ সেন ঐ ঘাটে রয়ে যান। ঐ সময় দলে নিত্যানন্দ প্রভুও ছিলেন। ইতিমধ্যে ভক্তগণ সামনে আগাতে থাকেন। কিছু দূর গিয়ে তারা সবাই এক গাছতলায় বসেছেন। শিবানন্দ সেন না আসলে ভোজনের ব্যবস্থা হয় না। অথচ ভক্তগণ পথশ্রমে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। তখন শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু রাগে অস্থির হয়ে শিবানন্দকে গালাগাল ও অভিশাপ দিতে থাকেন। ঠিক এই সময় শিবানন্দ সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁর স্ত্রী তাকে নিত্যানন্দ প্রভুর রাগ এবং অবশেষে অভিশাপ প্রদানের কথা জানালেন।

শিবানন্দ সব শুনে বিচলিত না হয়ে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে এসে তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। পূর্বেই শিবানন্দ সেনের প্রতি রাগ থাকায় প্রভু তাকে পা দিয়ে প্রহার করলেন। প্রভুর পাদ-প্রহার সত্ত্বেও শিবানন্দ বরং আনন্দিত হয়ে ভক্তগণের জন্য তাড়াতাড়ি প্রসাদ ভোজনের এবং বাসা ঘরের ব্যবস্থা করে নিত্যানন্দ প্রভুকে সেখানে নিয়ে যান। প্রভু এবং ভক্তগণের ভোজন যথারীতি হলো। এরপর শিবানন্দ নিত্যানন্দ প্রভুর চরণকমলে নিজের মাথা রেখে বললেন যে তিনি প্রভুর ভৃত্য। তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়ে প্রভু তাকে কৃপাই বর্ষণ করেছেন।

"আজি মোরে ভৃত্য করি অঙ্গীকার কৈলা।
যেমন অপরাধ ভৃত্যের যোগ্য ফল দিলা।
শাস্তির ছলে কৃপা কর এ তোমার করুণা।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন জনা॥
ব্রহ্মার দুর্লভ তোমার শ্রীচরণ রেণু।
হেন চরন স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু॥"
(চৈ.চ. অন্ত্য ১২/৩১-৩৩)।

একবার শিবানন্দ সেন তার বড় ছেলে চৈতন্য দাসকে নিয়ে পুরীধামে যান। সেখানে তিনি চৈতন্য দাসের মাধ্যমে মহাপ্রভুকে নিজের বাসগৃহে ভোজনের আমন্ত্রণ জানান। মহাপ্রভু চৈতন্য দাসের ভোজনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তখন শিবানন্দ এবং তার স্ত্রী আনন্দিত মনে প্রভুর জন্য অনেক কিছু রান্না করেন। যথাসময়ে মহাপ্রভু শিবানন্দের গৃহে আসলেন। শিবানন্দ দণ্ডবৎ প্রণাম করে প্রভুর পাদ-ধৌত করে ভোজনে বসালেন। প্রভু বললেন চৈতন্য দাসের আমন্ত্রণে তিনি এসেছেন। একথা শুনে চৈতন্য দাস প্রভুর সামনে দই, লেবু, আদা, ফুল-বড়া, লবণসহ খাদ্যদ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে এনে সুন্দরভাবে রাখতে লাগলেন। এই দেখে প্রভু মন্তব্য করেছিলেন–

"এই বালক আমার মত জানে।

সন্তুষ্ট হইলাম আমি ইহার নিমন্ত্রণে॥"
(চৈ. চ. অন্ত্য ১০/১৫০)।

এই বলে মহাপ্রভু আনন্দে ভোজন করতে লাগলেন। ভোজনের পর তাঁর নিজের পাত্রটি চৈতন্য দাসকে প্রভু দিয়ে দেন।

চার মাস প্রভুর কাছে অবস্থানের পর গৌড়ীয় ভক্তগণ পুরী থেকে ফিরে আসার উদ্যোগ নিলে মহাপ্রভু শিবানন্দকে ডেকে বলেন যে এবার তার যে পুত্র হবে তার নাম হবে পুরীদাস। শিবানন্দ প্রভুর আশীর্বাদ নিয়ে নবদ্বীপে ফিরে আসেন। কয়েক মাস পর তার পুত্র হয়। জ্যোতিষী বিচার করে ছেলের নাম দেন পরমানন্দ দাস।

পরের বছর আবার শিবানন্দ স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও ভক্তগণসহ পুরীধামে আসলেন। একদিন স্ত্রীসহ তিনি মহাপ্রভুর নিকট এলেন এবং শিশু ছেলেকে তাঁর শ্রীচরণের কাছে ছেড়ে দিলেন। শিশু মহাপ্রভুর পদ্মবর্ণের চরণের দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রভু তখন হেসে তাঁর শ্রীচরণের অঙ্গুষ্ঠ শিশুর সামনে তুলে ধরেন। শিশু সেটি দু'হাত দিয়ে ধরে আনন্দে চুষতে আরম্ভ করে। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তা দেখে আনন্দে হরি হরি ধ্বনি দিতে লাগল। এই শিশুই পরবর্তীকালে বিখ্যাত কবি কর্ণপুর গোস্বামী হয়েছিলেন।

শ্রী শিবানন্দ সেন নিজে একজন পদকর্ত্তাও ছিলেন।

৬. রঙ্গদেবী ⟹ গোবিন্দ ঘোষ

ব্রজলীলায় যিনি শ্রীমতি রাধিকার অষ্ট সখীর অন্যতম, রঙ্গদেবী ছিলেন তিনি গৌড়লীলায় গোবিন্দ ঘোষ নামে আবির্ভূত হন। গোবিন্দ ঘোষের অন্য দুই ভাই ছিলেন মাধব ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ। এরা সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। তারা নৃত্য-কীর্ত্তনে শ্রীমন্ মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুকে যথেষ্ট আনন্দ দিতেন।

"গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব তিন ভাই।
যা সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি॥"
(চৈ. চ.আদি ১০/১১৫)।

"মাধব, গোবিন্দ, বাসুদেব তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই॥"
(চৈ. ভাগবত ৫/১৫৯)।

গৌরগণোদ্দেশ দিপীকা গ্রন্থ অনুযায়ী গোবিন্দ ঘোষ ব্রজলীলায় শ্রীমতি রাধিকার কলাবতী সখী ছিলেন।

শ্রী গোবিন্দ ঘোষ উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থকুলে আবির্ভূত হন। কেউ কেউ বলেন গোবিন্দ ঘোষের মামার বাড়ি সিলেট জেলার অর্ন্তগত বুড়ন বা বুরঙ্গী গ্রামে ছিল।

কোন কারণে গোবিন্দ ঘোষের বাবা কুমার হট্টে (বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হালিশহর নামক স্থান) এসে বসবাস আরম্ভ করেন। পরবর্তীকালে শ্রী গোবিন্দ ঘোষ অগ্রদ্বীপে বাসস্থান পরিবর্তন করেন। তিনি অগ্রদ্বীপে শ্রী শ্রী গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রী গোবিন্দ ঘোষ মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন।

"শ্রী গোবিন্দ ঘোষ বলি যাঁহার খেয়াতি।
গৌরাঙ্গের শাখা অগ্রদ্বীপেতে নিবাস
শ্রী গোপীনাথ ঠাকুর যাহার প্রকাশ।"
(বৈষ্ণব সমাচার দর্পণ)।

অগ্রদ্বীপের নিকটবর্তী কাশীপুর-বিষ্ণুতলায় গোবিন্দ ঘোষের বাস ছিল। কারোও মতে বৈষ্ণবতলায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এখনও ঐ স্থানে ঘোষ উপাধিধারী কয়েক ঘর কায়স্থের বাস আছে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন নীলাচল থেকে ভক্তসঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করেন তখন গোবিন্দ তার সঙ্গে যাত্রা করেন। একদিন অগ্রদ্বীপে আহারের পর প্রভু হরিতকীর জন্য হাত বাড়াইলে গোবিন্দ ঘোষ দৌড় দিয়ে গ্রাম থেকে হরিতকী এনে প্রভুকে দেন। পরদিনও প্রভু হাত বাড়াইলে গোবিন্দ পূর্বদিনের আনা কয়েকটি হরিতকী থেকে একটি প্রভুকে দেন। হরিতকী এত তাড়াতাড়ি পাওয়ায় মহাপ্রভু অবাক হয়ে গোবিন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। জানতে পারলেন যে গোবিন্দ হরিতকী সঞ্চয় করে রেখেছিলেন। এতে মহাপ্রভু বলেন, গোবিন্দ তোমার সঞ্চয় বুদ্ধি যায় নাই। তাই তুমি এই স্থানেই থাক এবং গোপীনাথের সেবা প্রকাশ কর। গোবিন্দ প্রভুর আদেশে অগ্রদ্বীপে থেকে যান।

গোবিন্দ মহাপ্রভু কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়াতে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েন। এতে প্রভু তাকে আশ্বাস দেন। কিছুদিন পর গোবিন্দ ঘোষ গঙ্গায় স্নান করছেন এমন সময়ে একটি জিনিস তাঁর পিঠে এসে ঠেকে। তিনি জিনিসটি তুলে দেখলেন কাঠের মতো, তবে খুব ভারী। পরে রাতে স্বপ্নে দেখলেন এবং শুনলেন **"গোবিন্দ, ঐ কাঠখানি যত্ন করে রাখিও, প্রভু আগমন করিলে তাঁহাকে দিও।"** গোবিন্দ ঐ রাতে কাঠখানি গৃহে আনতে গিয়ে দেখলেন সেটি কৃষ্ণ শিলা। পরদিন প্রাতে মহাপ্রভু তাঁর গৃহে আগমন করে বললেন, **"গোবিন্দ, তোমার আর চিন্তা নাই, কল্য এক ভাস্কর এসে ঐ শিলা হইতে বিগ্রহ নির্মাণ করিবে, তুমি প্রতিষ্ঠা করিবে।"** এরূপে শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ অগ্রদ্বীপে স্থাপিত হয়।

গোবিন্দ ঘোষ পরে প্রভুর আজ্ঞায় বিবাহ করে সস্ত্রীক গোপীনাথের সেবা করতে থাকেন। তার একটি পুত্রও জন্মে। কিন্তু প্রথমে স্ত্রী এবং পরে পুত্রের মৃত্যু হলে গোবিন্দ অতিশয় কাতর হয়ে পড়েন। এমনকি গোপীনাথের সেবা বন্ধ করে দেন। তখন গোবিন্দ ঘোষ স্বপ্নে দেখেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে বলছেন ঃ

"গোবিন্দ যাহার এক পুত্র মরে, সেকি অনাহারে অপর পুত্রকেও মারে?" তখন গোবিন্দ উত্তর দেন ঃ আমার পুত্র দ্বারা আমার ও আমার পিতৃপুরুষের জলপিণ্ডের আশা ছিল। তোমার সেবা করিয়া আমার কি লাভ হবে? তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন ঃ "আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, চিরদিন আমি তোমার মৃত্যু তিথিতে শ্রাদ্ধ করিব। এখন আমাকে খাইতে দাও।" তখন গোবিন্দ আনন্দে আবার গোপীনাথের সেবা করতে আরম্ভ করেন।

শ্রী গোবিন্দ ঘোষ অপ্রকট হওয়ার পূর্বে বলেছিলেন, আমার দেহ দাহ করিও না। দোল প্রাঙ্গণের পাশে সমাধি দিও। কথিত আছে তাঁর অপ্রকটের পরদিনই শ্রীগোপীনাথ হাতে কুশ বেঁধে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ড দান করেন। আজও গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের অপ্রকট তিথিতে শ্রীগোপীনাথ পিণ্ড দান করেন।

৭. তুঙ্গবিদ্যা ⇒ বক্রেশ্বর পণ্ডিত

ব্রজলীলায় যিনি শ্রীমতি রাধিকার অষ্ট সখীর অন্যতম তুঙ্গবিদ্যা ছিলেন গৌড়লীলায় তিনিই বক্রেশ্বর পণ্ডিত নামে আবির্ভূত হন। শ্রী বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী। তার শিষ্য ছিলেন ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী। এই ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী **"ধ্যানচন্দ্র পদ্ধতি"** নামে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাতে বলা হয়েছে ঃ "যিনি পূর্বে ব্রজে নৃত্যগীত বিশারদ তুঙ্গবিদ্যা গোপী ছিলেন অধুনা তিনি শ্রী বক্রেশ্বর পণ্ডিত নামে খ্যাত হন।" **গৌরগণোদ্দেশ দিপীকা** মতে তিনি শ্রীরাধিকার শশিরেখা সখী ছিলেন।

আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথীতে বক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব দিন। তার আবির্ভাব স্থান হুগলী জেলার ত্রিবেণীর কাছে গুপ্তিপাড়ায়। বক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য ও গীতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তিনি চব্বিশ প্রহর (অর্থাৎ ৭২ ঘণ্টা) এক নাগারে নৃত্য করতে পারতেন।

"বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর প্রিয় ভৃত্য।
একভাবে চব্বিশ প্রহর যার নৃত্য॥"
(চৈ. চ. আদি ১০/১৭)।

বক্রেশ্বর পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য শাখার অর্ন্তগত ছিলেন। তিনি ছিলেন মহাপ্রভুর কীর্ত্তন সঙ্গী।

"প্রভু বলে তুমি মোর এক শাখা।
আকাশে উড়িয়া যাও পাও আর পাখা॥"
(চৈ. চ. আদি ১০/২০)।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন প্রথমে নবদ্বীপে সংকীর্ত্তনলীলা প্রবর্তন করেন তখন বক্রেশ্বর পণ্ডিত একজন উচুদরের গায়ক এবং নর্ত্তক ছিলেন। প্রভুর নবদ্বীপ লীলার সময়, সন্যাস গ্রহণের পর পুরীধামে গমনের সময় এবং সেখানে অবস্থানের সময়ও বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গী ছিলেন। মহাপ্রভু যখন রামকেলিতে যান তখনও বক্রেশ্বর পণ্ডিত তার সাথে ছিলেন। এভাবে বক্রেশ্বর পণ্ডিত বহু স্থানেই প্রভুর সঙ্গী ছিলেন।

বক্রেশ্বর পণ্ডিত মহাপ্রভুর এতই প্রিয়ভাজন ছিলেন যে তিনি নবদ্বীপবাসী দেবানন্দ পণ্ডিতকে কৃপা করার পর প্রভু তাকে গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে নবদ্বীপে ভাগবত শাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলে দেবানন্দ পণ্ডিতের খ্যাতি ছিল। একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত তার ভাগবত পাঠ শুনতে যান। ভাগবত শুনে শ্রীবাস প্রেমে ক্রন্দন করতে থাকেন। এই দেখে দেবানন্দের কিছু অজ্ঞ ছাত্র পাঠ শ্রবণে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে মনে করে শ্রীবাস পণ্ডিতকে ঘরের বাইরে নিয়ে রেখে দেয়। ভক্ত ভাগবতের প্রতি নিজের ছাত্রদের এরূপ আচরণ দেখেও দেবানন্দ পণ্ডিত কোন প্রতিবাদ করেন নাই।

এর ফলে মহাভাগবত চরণে তাঁর অপরাধ হয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এ বিষয় জানতে পেরে বলেন যে যারা ভাগবত পড়ে, অথচ ভক্ত ভাগবতকে সমাদর করে না তারা অপরাধী। শত কল্পেও ভাগবত পরে তারা ভগবৎ প্রেম পাবে না। কারণ গ্রন্থ ভাগবত এবং ভক্ত ভাগবত অভিন্ন। গ্রন্থ ভাগবত জানতে হলে অকপটে ভক্ত ভাগবতের সেবা করতে হয়। এই কারণে নবদ্বীপ–লীলাকালে মহাপ্রভু দেবানন্দকে উপেক্ষা করেন। কৃষ্ণপ্রেম তাকে দিলেন না।

কিছুকাল পর একদিন বক্রেশ্বর পণ্ডিত নবদ্বীপের কুলিয়ায় এক ভক্তের গৃহে নৃত্যগীত করতে থাকেন। দেবানন্দ পণ্ডিত খবর পেয়ে সেখানে যান এবং বক্রেশ্বর পণ্ডিতের দিব্য প্রেম ও আবেশ দেখে মুগ্ধ হন। ক্রমে লোকজনের ভিড় আরম্ভ হয়। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের নৃত্য-কীর্ত্তনে যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য দেবানন্দ পণ্ডিত একখানি বেত হাতে নিয়ে লোকজনের ভিড় সামলাতে থাকেন। নৃত্য-গীতের পর দেবানন্দ পণ্ডিত তাকে দণ্ডবৎ প্রণতি জানান। তার এই সেবা দেখে বক্রেশ্বর পণ্ডিত খুব খুশী হয়ে তাকে এই বলে আশীর্বাদ করলেন যেন তার কৃষ্ণভক্তি হয়। ভক্তের কৃপা ও আশীর্বাদে কৃষ্ণে ভক্তি হয়। তাই ঐদিন থেকে দেবানন্দ পণ্ডিতের কৃষ্ণভক্তি হলো।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু এক সময় শচীমাতা ও গঙ্গা দর্শনের জন্য কুলিয়ায় এলেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিতকে দেবানন্দ সেবা করায় তিনি সন্তুষ্ট হয়ে এবার তাকে কৃপা করলেন।

"প্রভু বলে তুমি যে সেবিলা বক্রেশ্বর।
অতএব হইলা তুমি আমার গোচর।"
(চৈ. ভাগবত অন্ত্য ৩/৪৯২-৪৯৩)।

নীলাচলে রথযাত্রার সময় যে চারটি সম্প্রদায় গঠন করা হতো তার মধ্যে একটি সম্প্রদায়ের প্রধান নৃত্যকার ছিলেন বক্রেশ্বর পণ্ডিত। শ্রী বক্রেশ্বর পণ্ডিত আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠি তিথিতে অপ্রকট হন।

৮. সুদেবী ⇒ বাসুদেব ঘোষ

ব্রজলীলায় শ্রী রাধিকার অষ্ট সখীর অন্যতম সুদেবী গৌড়লীলায় বাসুদেব ঘোষ নামে আবির্ভূত হন। **গৌরগণোদ্দেশ দিপীকা** গ্রন্থ অনুযায়ী বাসুদেব ঘোষ ব্রজলীলার গুণতুঙ্গা সখী ছিলেন।

শ্রী বাসুদেব ঘোষ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলে আবির্ভূত হন। তারা আট ভাই ছিলেন। এর মধ্যে তিনি সহ আর দুই ভাই শ্রী মাধব ঘোষ ও শ্রী গোবিন্দ ঘোষ সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। অপর দুই ভাইয়ের মতো বাসুদেব ঘোষ মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুর সাথে থাকতেন।

বাসুদেব ঘোষের শ্রীপাট (বাসস্থান) ছিল তমলুকে। প্রতি বছর অপর দুই ভাইয়ের সাথে তিনিও মহাপ্রভুর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য পুরীধামে যেতেন। সেখানে তারা রথ যাত্রার সময় নৃত্য এবং কীর্ত্তন করতেন।

বাসুদেব ঘোষ শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে এঁরা তিন ভাই ব্রজের মধুর রসের আশ্রয় বিগ্রহের (শ্রীমতি রাধিকার) কায়ব্যুহ ছিলেন।

শ্রী বাসুদেব ঘোষ একজন বিখ্যাত পদকর্ত্তা ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর শৈশব লীলার পদ বেশি বর্ণনা করেছেন। তাঁর রচিত মহাপ্রভুর একটি অতি সুন্দর শৈশব লীলার বর্ণনার কিছু অংশ তুলে ধরা হল।

"শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়॥
বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে– বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন গমনে॥"

এছাড়াও বাসুদেব ঘোষ শ্রীগৌরাঙ্গই যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রী জগন্নাথ সে সম্পর্কেও সুন্দর গীত রচনা করেছেন।

"জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন।
ত্রিভুবন করে যাঁর চরণ বন্দন॥
নীলাচলে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধর।
নদীয়া নগরে দণ্ড কমন্ডলু কর॥
....
বাসুদেব ঘোষ বলে করি যোড় হাত।
যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ॥"

শ্রী বাসুদেব ঘোষ **গৌরাঙ্গ-চরিত** এবং **নিমাই সন্যাস** নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে **মেদিনীপুরের ইতিহাস** বইতে উল্লেখ রয়েছে। বাসুদেব ঘোষ কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে অপ্রকট হন।

শ্রীগৌর লীলার চৌষট্টি মহান্ত

শ্রীগৌর লীলার যে অষ্ট প্রধান মহান্তের কথা আলোচনা করা হয়েছে তাঁদের প্রত্যেকের অনুগত আটজন করে সর্বমোট চৌষট্টি মহান্ত রয়েছেন। [দ্রষ্টব্য ঃ **বৃহৎ ভক্তিতত্ত্বসার** এবং **শ্রী শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান ৩য় খণ্ড**]

ক. স্বরূপ দামোদরের অনুগত অষ্ট মহান্ত

ব্রজলীলায় ললিতা সখীর অনুগত যে অষ্ট সখী ছিলেন তাঁদের বিপরীতে গৌড়লীলায় স্বরূপ দামোদরের অনুগত অষ্ট মহান্ত হলেন নিম্নরূপ।

ব্রজলীলায় ললিতার অনুগত সখীবৃন্দ	গৌড়লীলায় স্বরূপ দামোদরের অনুগত মহান্তগণ
(i) রত্নপ্রভা ⇒	আচার্যরত্ন (চন্দ্রশেখর দেব)।
(ii) রতিকলা ⇒	রত্নগর্ভ ঠাকুর।
(iii) সুভদ্রা ⇒	চন্দ্র শেখর দাস।
(iv) ভদ্ররেখিকা ⇒	ভূগর্ভ ঠাকুর।
(v) সুমুখী ⇒	রাঘব গোস্বামী।
(vi) ধনিষ্ঠা ⇒	দামোদর পণ্ডিত।
(vii) কলহংসী ⇒	কৃষ্ণদাস ঠাকুর।
(viii) কলাপিনী ⇒	কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর।

(i) রত্নপ্রভা ⟹ আচার্য রত্ন শ্রী চন্দ্রশেখর দেব বা চন্দ্রশেখর আচার্য ছিলেন শ্রীগৌর সুন্দরের মেসোমশায়। তিনি আচার্যরত্ন নামে খ্যাত।

"আচার্য্যরত্নের নাম শ্রী চন্দ্রশেখর।
যাঁর ঘরে দেবীভাবে নাচেন ঈশ্বর।"
(চৈ. চ. আদি ১০/১৩)।

তিনি শচীদেবীর ভগিনী শ্রীমতি সর্বজয়াকে বিবাহ করেছিলেন। গৌরগণোদ্দেশ দিপীকা গ্রন্থ মতে তিনি ছিলেন নব নিধির অন্যতম। তাঁর আদি বাসস্থান ছিল তৎকালীন পূর্ববঙ্গের সিলেট জেলায়। পরবর্তীতে নবদ্বীপে এসে শ্রী জগন্নাথ মিশ্রের গৃহের কাছাকাছি বসবাস করতে থাকেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন শ্রী জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে আবির্ভূত হন তখন তাঁকে দেখে চন্দ্রশেখর জগন্নাথ মিশ্রকে ইঙ্গিতে বলেন যে তার ঘরে শ্রীভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন। আচার্যরত্ন ও তার স্ত্রী সর্বজয়া প্রায় দিনই মিশ্র-গৃহে এসে শিশুর তত্ত্বাবধান করতেন। একটু বড় হলে তাঁরা শিশুকে কোন কোন দিন নিজেদের গৃহে নিয়ে আসতেন। তাঁদের কোন সন্তান না থাকায় তারা এঁকেই পুত্রসম আদর করতেন।

শ্রী জগন্নাথ মিশ্র অপ্রকট হলে তাঁর সংসারের সব কিছু চন্দ্রশেখর আচার্য দেখাশুনা করতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস না করে শচীমাতা কিছু করতেন না। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বড় হয়ে তাঁর নবদ্বীপ লীলার সময় শ্রীবাস অঙ্গন ছাড়াও চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহেও নানা লীলা-অভিনয় করতেন। নবদ্বীপে মহাপ্রভুর যে কোন লীলায় চন্দ্রশেখর আচার্য তাঁর অনুগামী হতেন।

মহাপ্রভু যখন কাটোয়ায় শ্রীপাদ কেশব ভারতীর কাছে সন্যাস গ্রহণের জন্য আসেন তখন চন্দ্রশেখর আচার্য তাঁর অভিভাবকরূপে সব কাজ সম্পাদন করেছিলেন। তারপর মহাপ্রভুর নির্দেশে নবদ্বীপে ফিরে এসে সবাইকে তাঁর সন্যাস গ্রহণের বিস্তারিত বিবরণ দেন। তিনি এই সময় শচীমাতা এবং বিষ্ণুপ্রিয়া সহ অপরাপর ভক্তবৃন্দকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। মহাপ্রভুর পুরীধামে অবস্থানকালে চন্দ্রশেখর অপরাপর গৌড়ীয় ভক্তগণের সাথে প্রতি বছর সেখানে গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হতেন।

চন্দ্রশেখর আচার্য এবং তাঁর পত্নী সর্বজয়া মহাপ্রভুর অতি ভক্ত ছিলেন। এজন্য প্রভু বলতেন যে তিনি তাঁদের প্রেমে বাঁধা রয়েছেন।

(ii) রতিকলা ⟹ রত্নগর্ভ ঠাকুর শ্রীমদ্ ভাগবতের অধ্যাপক ছিলেন। শ্রীপাট তৎকালীন পূর্ববঙ্গের সিলেট জেলার বুরুঙ্গা গ্রামে। তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পিতা শ্রী জগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গী ছিলেন।

"রত্নগর্ভ আচার্য বিখ্যাত তাঁর নাম।
প্রভুর পিতার সঙ্গী জন্ম এক স্থান।"
(চৈ. ভাগবত মধ্য ১/২৯৬)।

রত্নগর্ভ আচার্যের তিন ছেলে ছিল। তাদের নাম ছিল কৃষ্ণানন্দ, জীব এবং যদুনাথ কবিচন্দ্র। রত্নগর্ভ ঠাকুর ভাগবতে পরম পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁর মুখে ভাগবত শ্রবণ করে প্রেমে বিহ্বল হয়েছিলেন।

"ভাগবতে পরম পণ্ডিত দ্বিজবর।
সুস্বরে পড়য়ে শ্লোক বিহ্বল অন্তর॥
ভক্তিযোগে শ্লোক পড়ে পরম আবেশে।
প্রভুর কর্ণেতে আসি হইল প্রবেশে॥"
(চৈ. ভাগবত মধ্য ১/২৯৮-২৯৯)।

(iii) সুভদ্রা ⇒ চন্দ্রশেখর দাস চন্দ্রশেখর দাস জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। তিনি কাশিবাসী ছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভক্ত তপন মিশ্রের সাথে তাঁর খুবই বন্ধুত্ব ছিল।

"বারানসী মধ্যে প্রভুর ভক্ত তিনজন।
চন্দ্রশেখর বৈদ্য আর মিশ্র তপন।"
(চৈ. চ. আদি ১০/১৫২)।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু কাশীতে চন্দ্রশেখর বৈদ্যের বাসস্থানে অবস্থান করেছিলেন।

"কাশীতে লেখক শূদ্র চন্দ্রশেখর।
তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা-নির্বাহন।
সন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ।"
(চৈ. চ. আদি ৭/৪৫-৪৬)।

এই চন্দ্রশেখর গৃহে প্রভুর অবস্থানকালেই শ্রী সনাতন গোস্বামী দরবেশ বেশে আগমন করেছিলেন। কাশীতে তার সাথে শ্রী রূপ গোস্বামী এবং জগদানন্দের মিলন হয়েছিল। শ্রী সনাতন গোস্বামী কাশীতে যে স্থানে বসে মহাপ্রভুর কাছ থেকে তত্ত্ব কথা শুনেছিলেন সেখানে চন্দ্রশেখর একটি তুলসী বেদী নির্মাণ করে স্মৃতিরক্ষণ করেছিলেন।

(iv) ভদ্ররেখিকা ⇒ ভূগর্ভ ঠাকুর (গোস্বামী) ভূগর্ভ ঠাকুর বা ভূগর্ভ গোস্বামী শ্রী গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। গৌরগণোদ্দেশ দিপীকা গ্রন্থ অনুযায়ী

তিনি ব্রজের প্রেমমঞ্জরী ছিলেন। সাধন দিপীকা অনুযায়ী ভূগর্ভ ঠাকুর লোকনাথ গোস্বামীর কাকা। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আজ্ঞায় তিনি ও লোকনাথ গোস্বামী প্রথমে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করে শ্রীকৃষ্ণের লুপ্ত লীলাস্থলসমূহ উদ্ধার করেছিলেন।

শ্রী ভূগর্ভ ঠাকুরের প্রধান শিষ্য ছিলেন শ্রীচৈতন্য দাস, শ্রী মুকুন্দানন্দ চক্রবর্তী, প্রেমী কৃষ্ণদাস প্রমুখ। তাঁরা শ্রীগোবিন্দের পূজারী ছিলেন। শ্রী ভূগর্ভ গোস্বামী কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে ব্রজধামে নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন।

(v) সুমুখী ⇒ রাঘব গোস্বামী শ্রী রাঘব গোস্বামী ভারতের দাক্ষিণাত্যের রামনগর নিবাসী কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। গৌরগণোদ্দেশ দিপীকা মতে তিনি ব্রজলীলার চম্পকলতা। তিনি গিরি-গোবর্দ্ধনে বাস করতেন। রাঘব গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্রী নরোত্তম ঠাকুরকে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে পরিভ্রমণ করেছিলেন। রাঘব গোস্বামী প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে সর্বদা রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্য চরিত গেয়ে বেড়াতেন।

তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে অপ্রকট হন। সেখানে তাঁর সমাধি আছে।

(vi) ধনিষ্ঠা ⇒ দামোদর পণ্ডিত দামোদর পণ্ডিত মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। গৌরগণোদ্দেশ দিপীকা গ্রন্থ অনুযায়ী তিনি পূর্বলীলায় শৈব্যা ও সরস্বতী ছিলেন।

দামোদর পণ্ডিত সব কিছুতেই নিরপেক্ষভাবে তার মতামত প্রকাশ করতেন। এক সময় পুরীধামে অবস্থানকালে মহাপ্রভুর কছে এক অল্প বয়স্কা বিধবা ব্রাহ্মণ সুন্দরী মহিলা তার ছেলেকে নিয়ে প্রায়ই আসতেন। দামোদর পণ্ডিত তাদের এই আসা-যাওয়া পছন্দ করতেন না। তিনি নিষেধ করা সত্ত্বেও মা ও ছেলে নিত্যদিন মহাপ্রভুকে দেখতে আসতো। মহাপ্রভুও ঐ ছেলেটিকে স্নেহ করতেন।

"দামোদর বার বার নিষেধ করেন ব্রাহ্মণ কুমারে।
প্রভু না দেখিলে সেই রহিতে না পারে।"

(চৈ. চ. অন্ত্য ৩/৫)।

একদিন সেই ব্রাহ্মণ কুমার এসেছে তার মাকে নিয়ে। প্রভুও তাকে স্নেহ করছেন। দামোদরের আর সহ্য হল না। তিনি মুখর হয়ে উঠলেন। প্রভু এই দেখে দামোদরকে প্রশ্ন করলে তিনি নিরপেক্ষভাবে বললেন যে এই সুন্দরী রমনী বালকসহ আসলে সন্যাসী মহাপ্রভু সম্পর্কে লোকে কুৎসা রটাতে পারে।

"পণ্ডিত হঞা মনে কেনে বিচার না কর।
রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেনে কর?
যদপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।

তথাপি তাহার দোষ-সুন্দরী যুবতী॥
তুমিও পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোক কানাকানি বাতে দেহ অবসর।"

দামোদরের কথা শুনে মহাপ্রভু পরম আনন্দিত হন এবং বলেন যে দামোদরের সমান তাঁর আর অন্তরঙ্গ নেই।

পরবর্তী সময়ে মহাপ্রভু দামোদরকে উপযুক্ত বিবেচনা করে শচীমাতা ও শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নবদ্বীপ ধামে পাঠিয়ে দেন। দামোদর মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নবদ্বীপে শচীমাতার নিকট বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। এক সময় দামোদর নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করলে মহাপ্রভু তাকে শচীমাতার বিষ্ণুভক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি নিরপেক্ষভাবে উত্তর দিয়েছিলেন–

'আইর প্রসাদে সে তোমার বিষ্ণুভক্তি।
যত কিছু তোমার, সকল তাঁর শক্তি॥"
(চৈ. ভাগবত অন্ত্য ৯/১০৮)।

দামোদর পণ্ডিত সব ব্যাপারেই তার নিরপেক্ষ মতামত দিতেন। কোন কিছু ব্যতিক্রম দেখলে তিনি মহাপ্রভুকেও বাক্য দণ্ড দিতে কার্পণ্য করতেন না।

(vii) কলহংসী ⇒ কৃষ্ণদাস ঠাকুর শ্রী শ্যামলাল গোস্বামী রচিত **প্রেমসম্পুটম** গ্রন্থ অনুযায়ী কৃষ্ণদাস ঠাকুর শ্রী নরোত্তম দাস ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু অভিরাম দাসের **পাট পর্যটন** অনুসারে তিনি শ্রী অভিরাম গোস্বামী শাখার অর্ন্তগত– অর্থাৎ তাঁর শিষ্য ছিলেন। এই মতে কৃষ্ণদাস ঠাকুর হুগলী জেলার খানাকুলে বসবাস করতেন।

(viii) কলাপিনী ⇒ কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর ব্রাহ্মণ এবং শ্রী নিত্যানন্দের পারিষদ ছিলেন। গৌরগণোদ্দেশ দিপীকা মতে তিনি পূর্ব লীলায় কলাবতী সখী ছিলেন। কৃষ্ণানন্দ রত্নগর্ভাচার্যের জৈষ্ঠ্যপুত্র ছিলেন। জীব পণ্ডিত এবং যদুনাথ কবিচন্দ্র নামে তার দুই ভাই ছিলেন।

খ. রায় রামানন্দের অনুগত অষ্ট মহান্ত

ব্রজলীলায় শ্রীমতি রাধিকার অন্যতম প্রধান সখী বিশাখার অনুগত যে অষ্ট সখী ছিলেন তারাই শ্রী গৌড়লীলায় রায় রামানন্দের অনুগত মহান্ত হিসাবে আবির্ভূত হন। এরা হলেন নিম্নরূপ।

ব্রজলীলায় বিশাখার অনুগত সখীবৃন্দ	গৌড়লীলায় রায় রামানন্দের অনুগত মহান্তবৃন্দ।
(i) মাধবী ⇒	মাধব আচার্য।
(ii) মালতী ⇒	শুভানন্দ।
(iii) হরিণী ⇒	নন্দন আচার্য।
(iv) চপলা ⇒	শঙ্কর ঠাকুর (পণ্ডিত)।
(v) সুরভী ⇒	সুদর্শন ঠাকুর।
(vi) শুভনীনা ⇒	সুবুদ্ধি মিশ্র (রায়)।
(vii) কুঞ্জরী ⇒	বাসুদেব দত্ত।
(viii)চন্দ্ররেখিকা ⇒	রামচন্দ্র দত্ত।

(i) মাধবী ⇒ মাধব আচার্য গৌরগণোদ্দেশ দিপীকা গ্রন্থ অনুযায়ী মাধব আচার্য পূর্বলীলায় বিশাখা যুথের মাধবী সখী ছিলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন। মাধব আচার্য শ্রী গদাধর পণ্ডিতের শাখাভুক্ত। তিনি **শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল** নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

"মাধব আচার্য বন্দো কবিত্ব শীতল।
যাঁহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল॥"
(বৈষ্ণব বন্দনা)।

এই গ্রন্থটি মঙ্গলকাব্যের ধরনে লিখিত। শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্দ এর উপাদান হলেও অপরাপর পুরাণেরও সাহায্য নেয়া হয়েছে। [**শ্রী শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৩০৯**]

(ii) মালতী ⇒ শুভানন্দ গৌরগণোদ্দেশ দিপীকা গ্রন্থ অনুযায়ী পূর্বলীলায় শুভানন্দ বিশাখা যুথের মালতী সখী ছিলেন। শুভানন্দ শ্রীচৈতন্য শাখার অর্ন্তগত ছিলেন। তিনি অতিশয় গৌরাঙ্গ প্রেমিক ছিলেন। পুরীতে রথ যাত্রার সময় শ্রীরথের অগ্রভাবে নৃত্যকীর্ত্তনে বিভোর মহাপ্রভুর চোখ, নাক ও মুখ থেকে নির্গত জল অমৃতরূপে বিবেচনা করে পান করেছিলেন।

"কভু নেত্রে, নাসায় জল, মুখে পড়ে ফেন।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন॥
সেই ফেন লৈয়া শুভানন্দ কৈল পান।
কৃষ্ণপ্রেম-রসিক তেঁহো মহাভাগ্যবান॥"
(চৈ. চ. মধ্য ১৩/১০৯-১১০)।

শুভানন্দ খেতরীর মহোৎসবে অন্যদের সাথে উপস্থিত ছিলেন।

(iii) হরিণী ⇒ নন্দন আচার্য নন্দন আচার্য একজন গ্রহবিপ্র ছিলেন। পিতার নাম–লক্ষ্মী নারায়ণ সর্বজ্ঞ। তিনি কিছুদিন তারকেশ্বরের নিকট বহিরখণ্ড গ্রামে বাস করে পরে নবদ্বীপের শ্রীহট্টিয়া বা দক্ষিণ পাড়ায় বাস করেন। তিনি খঞ্জ বা খোড়া ছিলেন। [উল্লেখ্য যে গৌরগণোদ্দেশ দিপীকা অনুযায়ী পূর্বলীলার হরিণী গৌড়লীলায় হস্তিগোপাল ছিলেন]

নন্দন আচার্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয়ভাজন ছিলেন। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপে আগমন করে তার গৃহে দুই দিন ছিলেন। এর মধ্যে শ্রীমন্ মহাপ্রভু একরাত্রি নন্দন আচার্যের গৃহে আত্মগোপন করেছিলেন।

"নন্দন–আচার্য শাখা জগতে বিদিত।
লুকাইয়া দুই প্রভু যাঁর ঘরে স্থিত॥"
(চৈ. চ. আদি. ১০/৩৯)।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু যেদিন নবদ্বীপে মহালীলা প্রকাশ করেন সেদিন শ্রী অদ্বৈত প্রভু নন্দন আচার্যের গৃহে লুকায়িত ছিলেন। মহাপ্রভু সন্যাস নিয়ে পুরীধামে গমন করলে নন্দন আচার্য পরে সেখানে গমন করেন। আবার মহাপ্রভু ভারতের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করে পুরীতে ফিরে আসলে খঞ্জ হওয়া সত্ত্বেও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সবার আগে প্রভুকে অভ্যর্থনা করতে ছুটে গিয়েছিলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য যখন নবদ্বীপ ধাম দর্শন করতে আসেন তখন তিনি নন্দন আচার্যের গৃহে নিত্যানন্দ প্রভুকে দর্শন করে ধন্য হয়েছিলেন।

"শ্রী নন্দন আচার্য পরম ভাগ্যবান্।
দেখে শ্রীনিবাস এই ভবন তাহার॥
ভক্তগোষ্ঠী সহ প্রভু গিয়া এ ভবনে।
দেখে নিত্যানন্দ প্রভু আছয়ে ধেয়ানে॥"
(ভক্তি সন্দর্ভ ঃ ১২/২৪২২-২৩)।

(iv) চপলা ⇒ শঙ্কর পণ্ডিত (ঠাকুর) পূর্বলীলার বিশাখার যুথের সখী চপলা গৌড়লীলায় শঙ্কর পণ্ডিত হিসাবে আবির্ভূত হন। তবে গৌরগণোদ্দেশ দিপীকা মতে তিনি পূর্বলীলায় ভদ্রা সখী ছিলেন। তিনি দামোদর পণ্ডিতের ভাই ছিলেন।

শঙ্কর পণ্ডিত মহাপ্রভুর পদতলে শয়ন করতেন। মহাপ্রভু তার উপর পা রেখে ঘুমাতেন। এজন্য বৈষ্ণবজগতে শঙ্কর পণ্ডিতের নাম হয়েছিল প্রভু-পাদোপধাম। অনেক সময় ঘুম ভেঙ্গে গেলে শঙ্কর পণ্ডিত উঠে প্রভুর দুই-পা চেপে ধরে রাত্রি জাগরণ করতেন। এককথায় তিনি ছিলেন প্রভুর পদদ্বয়ের উপাধান (বালিশ)।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণ-সম্বাহন সৌভাগ্যই তাকে বৈষ্ণব জগতে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

(v) সুরভী ⇒ সুদর্শন ঠাকুর শ্রীগৌরের ভক্ত ছিলেন। বিস্তারিত পরিচয় জানা যায় নাই। শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ অনুযায়ী মহাপ্রভুর বিদ্যাগুরু ছিলেন।

"সুদর্শন আর গঙ্গাদাস যে পণ্ডিতে।
পড়িলা জগত-গুরু তা সভার হিতে॥"
(শ্রীচৈতন্য মঙ্গল আদি পৃঃ ৬৪)।

(vi) শুভনীনা ⇒ সুবুদ্ধি মিশ্র (রায়) দ্বিতীয় চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা জয়ানন্দের পিতা। তিনি শ্রীচৈতন্য শাখার অর্ন্তগত ছিলেন। তবে গৌরগণোদ্দেশ দিপীকা অনুযায়ী পূর্বলীলায় তিনি ব্রজের গুণচূড়া সখী ছিলেন। তাঁর পত্নীর নাম রোচনা এবং পুত্রের নাম–জয়ানন্দ।

সুবুদ্ধি রায় পূর্বে গৌড়ের রাজা ছিলেন। সুলতান হোসেন শাহ্ করোয়ার জল এর মুখে দিয়ে জাতি নাশ করেন। এজন্য তিনি ব্রাহ্মণদের শরণাপন্ন হলে তারা তুষানলে (তুষের আগুনে) প্রাণত্যাগই প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে বিধান দেন। কিন্তু মহাপ্রভুর সাথে দেখা হলে তিঁনি হরিনামে সর্বপাপ বিনাশ হবে বলে সুবুদ্ধি রায়কে শ্রীবৃন্দাবনে গমনের আদেশ দান করেন।

সুবুদ্ধি রায় বৃন্দাবনে ভূগর্ভ গোস্বামী, লোকনাথ গোস্বামী, রূপ গোস্বামী প্রমুখের মতো বৈষ্ণব মহাজনদের সংস্পর্শে আসেন। এর ফলেই তিনি বৃন্দাবনে অতি দীনহীনভাবে জীবনযাপন করতে থাকেন। বন থেকে শুকনা কাঠ এনে বিক্রি করে তিনি অতি সামান্যভাবে জীবনযাপন করতেন। যা কিছু এ থেকে সঞ্চয় হতো তার দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সেবা করতেন।

"শুষ্ক কাষ্ঠ আনি রায় বেচে মথুরাতে।
পাঁচ ছয় পয়সা হয় এক এক বোঝাতে॥
আপনে রহে এক পয়সার চানা চাবাঞা।
আর পয়সা বানিয়া-স্থানে রাখেন ধরিয়া॥
দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তারে করান ভোজন।
গৌড়ীয়া আইলে দধিভাত, তৈল মর্দন॥"
(চৈ. চ. মধ্য ২৫/১৯৭-১৯৯)।

(vii) কুঞ্জরী ⇒ বাসুদেব দত্ত বাসুদেব দত্ত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পারিষদ শ্রীমুকুন্দ দত্তের বড় ভাই ছিলেন। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম জেলার ছন্হরা গ্রামে

আবির্ভূত হন। প্রেম বিলাস গ্রন্থ মতে তিনি অম্বষ্ঠকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ধর্মানন্দ ভারতী কর্তৃক লিখিত সুবর্ণবণিক পুস্তকে একে সুবর্ণ-বণিক কুল উদ্ভূত বলা হয়েছে। বাসুদেব দত্ত মহাপ্রভুর অতিশয় প্রিয় ছিলেন।

"বাসুদেব দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়।
সহস্রমুখে যার গুণ কহিলে না হয়॥"
(চৈ. চ. আদি ১০/৪১)।

শ্রীবাসুদেব দত্ত সুকণ্ঠী, সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশারদ এবং মহাপ্রভুর কীর্তন সঙ্গী ছিলেন। মহাপ্রভু বলতেন–

"যদ্যপি মুকুন্দ আমা সঙ্গে শিশু হইতে।
তাঁহা হইতে অধিক সুখ তোমারে দেখিতে।"
(চৈ. চ. আদি ১১/১৩৮)।

এই বাসুদেব দত্তই মহাপ্রভুকে বলেছিলেন ঃ প্রভু জগতের যত জীবের পাপরাশি আমাকে দিন। আমি তাদের হয়ে অনন্তকাল নরকে থাকবো। আর তারা নিশ্চিন্তে তোমার নাম করে সুখে থাক।

বাসুদেব দত্ত এক সময় পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কাঁচড়া পাড়ায় বসবাস করেছিলেন। পরে অবশ্য তিনি সেখান থেকে পুরীধামে চলে যান এবং সেখানে মহাপ্রভুর কাছে থাকতেন। কাচড়া পাড়ার নিকটবর্তী মামগাছিতে তাঁর সেবিত শ্রীমদন গোপাল এখনও বিরাজমান আছে।

(viii) চন্দ্ররেখিকা ⇒ রামচন্দ্র দত্ত ব্রজলীলায় শ্রীমতি বিশাখার যুথের অন্যতম সখী চন্দ্ররেখিকা গৌড়লীলায় রায় রামানন্দের অনুগত মহান্ত হিসাবে রামচন্দ্র দত্ত নামে আবির্ভূত হন। তাঁর সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে না পারায় বইতে তা সন্নিবেশ করা গেল না।

গ. গোবিন্দানন্দের অনুগত অষ্ট মহান্ত

ব্রজলীলায় শ্রীমতি রাধিকার প্রধান অষ্ট সখীর অন্যতম সুচিত্রা সখীর অনুগত যে অষ্ট সখী ছিলেন তারাই গৌড়লীলায় শ্রী গোবিন্দানন্দের অনুগত মহান্ত হিসাবে আবির্ভূত হন।

ব্রজলীলায় সুচিত্রার অনুগত সখীবৃন্দ	গৌড়লীলায় গোবিন্দানন্দের অনুগত মহান্তগণ।
(i) রসোল্লাসা ⇒	মাধব ঘোষ।
(ii) তিলকিনী ⇒	ঠাকুর জগন্নাথ (কাষ্ট কাটা জগন্নাথ)।

(iii) শৌরসেনী ⇒	জগদীশ ঠাকুর (পণ্ডিত)।
(iv) সুগন্ধিকা ⇒	সদাশিব ঠাকুর (পণ্ডিত)।
(v) রমিলা ⇒	মুকুন্দ রায়।
(vi) কামনাগরী ⇒	কুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তী।
(vii) নাগরী ⇒	পুরন্দর আচার্য।
(viii)নাগবেলিকা ⇒	নারায়ণ বাচস্পতি।

(i) রসোল্লাসা ⇒ মাধব ঘোষ প্রসিদ্ধ শ্রী বাসুদেব ঘোষ ও শ্রী গোবিন্দ ঘোষের ভাই ছিলেন। তাঁর বাসস্থান দাঁই হাটে ছিল। তিন ভাইয়ের মধ্যে মাধব ঘোষ ছিলেন প্রধান কীর্ত্তনিয়া।

"শ্রী মাধব ঘোষ–মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগনে।
নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে॥
(চৈ. চ. আদি ১১/১৮)।

অপরাপর ভাইদের মতো শ্রী মাধব ঘোষও সংগীত রচয়িতা ছিলেন। তিনি শ্রীগৌর সুন্দরের বাল্যলীলা, নদীয়া-সংকীর্ত্তন বিলাস এবং সন্যাস লীলা ইত্যাদির সুন্দর বর্ণনা তাঁর বিভিন্ন সঙ্গীতে তুলে ধরেছেন। অপরাপর ভাইদের মতো শ্রী মাধব ঘোষও মহাপ্রভুর পুরীতে অবস্থানকালে প্রতি বছর গৌড়ভক্তদের সাথে সেখানে যেতেন এবং রথযাত্রায় কীর্ত্তনাদি করতেন।

মাধবের পদাবলী সংখ্যা-১২। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু যখন কৃষ্ণপ্রেম প্রচারের লক্ষ্যে পুরী থেকে গৌড়ে গমন করেন তখন গোবিন্দ ঘোষসহ দুই ভাই সঙ্গে এসেছিলেন।

(ii) তিলকিনী ⇒ কাষ্টকাটা জগন্নাথ তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরের কাষ্ট কাটা (কাঠাদিয়া) গ্রামে হলায়ুধ ভট্টাচার্যের বংশে রত্নাকর মিশ্রের জন্ম হয়। রত্নাকরের দুই পুত্র ⇒ সর্বানন্দ ও প্রকাশানন্দ। সর্বানন্দের পুত্রই জগন্নাথ। বাল্যকালে তিনি পিতৃহীন হন। তখন তার কাকা তাকে লালন-পালন করেন। এক সময় তিনি স্বপ্ন দেখেন মহাপ্রভু তাকে অদ্বৈত প্রভুর গৃহে যাওয়ার জন্য আদেশ করছেন। স্বপ্ন দেখে তিনি পাগলের ন্যায় দিনরাত হেঁটে এক সময় শান্তিপুরে উপস্থিত হন। সেখানে মহাপ্রভুর আদেশে তিনি শ্রীগদাধরের চরণাশ্রয়ী হন।

পরবর্তী সময়ে তার কাকা শান্তিপুরে আগমন করে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অনুমতি নিয়ে জগন্নাথকে দেশে নিয়ে যান এবং বিবাহ দিয়ে সংসারী করান। এছাড়াও

তৎকালীন নবাব-সরকারে তার একটি চাকুরীর ব্যবস্থাও করে দেন। জগন্নাথের গুণে নবাব সাহেব তাকে আড়িয়াল গ্রাম জায়গীরস্বরূপ প্রদান করলে তিনি কাষ্ট কাটা গ্রাম ত্যাগ করে ঐ স্থানে বসবাস করেন। কাঠাদিয়া গ্রামে জগন্নাথের বাসস্থান এখনও বর্তমান। তাঁর বংশধরগণ কাঠাদিয়া, আড়িয়ল, কামার খাড়া, পাইক পাড়া প্রভৃতি গ্রামে বাস করছেন।

(iii) শৌরসেনী ⇒ জগদীশ ঠাকুর জগদীশ ঠাকুর নবদ্বীপ ধামে বাস করতেন। তিনি শ্রীগৌর সুন্দরের একান্ত আপনজন ছিলেন।

জগদীশ ঠাকুরের ভাইয়ের নাম ছিল হিরণ্য পণ্ডিত। শিশুকালে মহাপ্রভু একদিন একাদশীতে এই দুই ভাইয়ের বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে সজ্জিত নৈবেদ্য খাওয়ার জন্য কান্না করলে এই দুই ভাই তা মহাপ্রভুর নিকটে এনে বালগোপাল জ্ঞানে তাঁকে ভোজন করান।

"জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়।
যারে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময়॥
দুই ভ্রাতার ঘরে প্রভু একাদশীর দিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইলা আপনে॥"
(চৈ. চ. আদি ১০/৭০-৭১)।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনের সময় দুই ভাই নিকটে থাকতেন। মহাপ্রভু যখন পুরীধামে ছিলেন তখন তারা গৌড়ীয় ভক্তগণের সাথে তাঁকে দর্শন করতে যেতেন।

(iv) সুগন্ধিকা ⇒ সদাশিব ঠাকুর (পণ্ডিত) শ্রীচৈতন্য শাখার অর্ন্তগত ছিলেন। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু প্রথমে এর গৃহেই অবস্থান করেছিলেন।

"সদাশিব পণ্ডিত যাঁর প্রভু পদে আশ।
প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর গৃহে বাস॥"
(চৈ. চ. আদি ১০/৩৪)।

"সদাশিব পণ্ডিত চলিলা শুদ্ধমতি।
যার ঘরে পূর্বে নিত্যানন্দের বসতি॥"
(চৈ. ভাগবত অন্ত্য ৮/১৯)।

সদাশিব পণ্ডিত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নদীয়া-লীলায় কীর্ত্তন-বিলাসের সঙ্গী ছিলেন। লক্ষ্মীবেশে নৃত্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করে মহাপ্রভু এঁকে কাঁচসজ্জা করতে আদেশ দিয়েছিলেন। (চৈ. ভাগবত মধ্য ১৮/৭-১৪)।

(v) রমিলা ⇒ মুকুন্দ রায় পূর্বলীলায় সূচিত্রা সখীর যুথের রমিলা সখী গৌড়লীলায় মুকুন্দ রায় হিসাবে আবির্ভূত হন। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনুগত ভক্ত ছিলেন।

(vi) কামনাগরী ⇒ কুমুদানন্দ চক্রবর্তী বৃন্দাবনবাসী শ্রীগৌর ভক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামীকে ইনিও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনা করতে অনুরোধ করেছিলেন।

"কুমুদানন্দ চক্রবর্তী, প্রেমী কৃষ্ণদাস॥
আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ।
শেষ লীলা শুনিতে সবার হৈল মন॥"
(চৈ. চ. আদি ৮/৬৯)।

(vii) নাগরী ⇒ পুরন্দর আচার্য তিনি শ্রীচৈতন্য শাখার অর্ন্তগত ছিলেন। মহাপ্রভুর পিতা শ্রী জগন্নাথ মিশ্রেরও আচার্য পুরন্দর আখ্যা ছিল। এজন্য মহাপ্রভু একে ভক্তিভাবে পিতা বলে সম্বোধন করতেন (চৈ. ভাগবত অন্ত্য ৮/৩১)।

"চৈতন্য-পার্যদ শ্রী আচার্য পুরন্দর।
পিতা করি যারে বলে গৌরাঙ্গ সুন্দর॥"
(চৈ. চ. আদি ১০/৩০)।

(viii) নাগবেলিকা ⇒ নারায়ণ বাচস্পতি শ্রীগৌর ভক্ত ছিলেন। অবশ্য গৌরগণোদ্দেশ দিপীকা গ্রন্থ অনুযায়ী পূর্বলীলায় তিনি শৌরসেনী সখী ছিলেন। বাচস্পতি এতটাই কৃষ্ণভক্ত ছিলেন যে গৌরভক্তরা তার সঙ্গ সব সময় কামনা করতেন।

ঘ. শ্রী রামানন্দ বসুর অনুগত অষ্ট মহান্ত

ব্রজলীলায় ইন্দুলেখা সখীর অনুগত যে অষ্ট সখী ছিলেন তাঁরাই গৌড়লীলায় শ্রী রামানন্দ বসুর অনুগত অষ্ট মহান্ত হিসাবে আবির্ভূত হন।

ব্রজলীলায় ইন্দুলেখার অনুগত সখীগণ।	গৌড়লীলায় রামানন্দ বসুর অনুগত মহান্তগণ।
(i) তুঙ্গভদ্রা ⇒	পরমানন্দ ঠাকুর।
(ii) রসতুঙ্গা ⇒	বল্লভ ঠাকুর (চৈতন্য)।
(iii) সুমঙ্গলা ⇒	বনমালী দাস।
(iv) চিত্ররেখা ⇒	শ্রীকর পণ্ডিত।
(v) চিত্রাঙ্গী ⇒	শ্রীনাথ মিশ্র।
(vi) মেদিনী ⇒	লক্ষ্মণ আচার্য।
(vii) মদনালসা ⇒	পুরুষোত্তম পণ্ডিত।
(viii) রঙ্গবাটী ⇒	জগদীশ পণ্ডিত।

(i) তুঙ্গভদ্রা ⇒ পরমানন্দ ঠাকুর প্রকৃত নাম পরমানন্দ ভট্টাচার্য। শ্রী ধাম বৃন্দাবনবাসী এবং শ্রী গদাধর পণ্ডিতের শাখার অর্ন্তগত। তিনি শ্রীরূপ এবং সনাতনের ভক্তিশাস্ত্র গুরু ছিলেন। তিনি বংশীবটে শ্রী শ্রী গোপীনাথ বিগ্রহ প্রাপ্ত হন এবং মধু পন্ডিতকে ঐ সেবা সমর্পন করেন।

(ii) রসতুঙ্গা ⇒ বল্লভ ঠাকুর (চৈতন্য) শ্রী গদাধর গোস্বামীর শিষ্য। কথিত আছে যে তিনি হিমালয়ে মহাশক্তির উপাসনা করতেন। একদা দেবী তাকে আদেশ করেন যে মূল মহাশক্তি শ্রীরাধা তখন শ্রী গৌরপ্রেম লক্ষ্মীরূপে নবদ্বীপ লীলায় বিরাজ করছেন। এই প্রত্যাদেশ পেয়ে তিনি নবদ্বীপে এসে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের কাছে দীক্ষিত হয়ে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হন। রাঢ় দেশে তার পূর্ব নিবাস থাকলেও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আজ্ঞায় তিনি বিক্রমপুরে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্য আগমন করে পঞ্চসারে বসবাস আরম্ভ করেন।

শ্রী বল্লভ চৈতন্য স্বপ্নে আদেশ পেয়ে শ্রীরাধারমন বিগ্রহ স্থাপন করেন।

(iii) সুমঙ্গলা ⇒ বনমালী দাস তিনি শ্রী অদ্বৈত প্রভুর শাখার অর্ন্তগত ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর প্রিয় সেবক ছিলেন।

(iv) চিত্ররেখা ⇒ শ্রীকর পণ্ডিত তিনি শ্রীচৈতন্য শাখার অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। পরম গৌরভক্ত ছিলেন।

(v) চিত্রাঙ্গী ⇒ শ্রীনাথ মিশ্র গৌরগণোদ্দেশ দিপীকা গ্রন্থ অনুযায়ী ব্রজলীলার চিত্রাঙ্গী ছিলেন। গৌড়লীলায় শ্রীনাথ মিশ্র নামে আবির্ভূত হন।

(vi) মেদিনী ⇒ লক্ষ্মণ আচার্য শ্রীগৌর ভক্ত ছিলেন। শ্রী হরিদাস সম্পাদিত **'নামামৃত-সমুদ্র" গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ**

"ওহে লক্ষ্মণাচার্য! এই মাত্র চাই।
অপ্রসাদি দ্রব্য যেন ভুলিয়া না খাই॥"

(vii) মদনালসা ⇒ পুরুষোত্তম পণ্ডিত পুরুষোত্তম পণ্ডিত শ্রী নিত্যানন্দ শাখার অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। শ্রীধাম নবদ্বীপে বাস করতেন।

"নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয়।
নিত্যানন্দ-নামে যাঁর মহোন্মাদ হয়।"
(চৈ. চ. আদি ১১/৩৩)।
"পণ্ডিত পুরুষোত্তমের নবদ্বীপে জন্ম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের মহাভৃত্য মর্ম।"
(চৈ. ভাগবত অন্ত্য ৫/৭৩৭)।

পুরুষোত্তম পণ্ডিত শ্রীমন্ মহাপ্রভুরও প্রিয়পাত্র ছিলেন।

(viii) রঙ্গবাটী ⇒ জগদীশ পণ্ডিত শ্রী নিত্যানন্দ শাখার অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। তাঁর বাসস্থান ছিল নদীয়া জেলার চাকদহের নিকট যশোড়া গ্রামে। জগদীশ পণ্ডিত অত্যন্ত কৃষ্ণপ্রেমিক ছিলেন।

"জগদীশ পণ্ডিত হয় পতিত-পাবন।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষাসম॥"
(চৈ.চ. আদি ১১/৩০)।

যশোড়া গ্রামে জগদীশ পণ্ডিতের স্থাপিত শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্তি এবং শ্রীজগন্নাথ দেবের মূর্তি আজও বিরাজমান।

ঙ. শিবানন্দ সেনের অনুগত অষ্ট মহান্ত

ব্রজলীলায় শ্রীমতি রাধিকার অন্যতম প্রধান সখী চম্পকলতার যে অষ্টসখী ছিলেন তারাই গৌড়লীলায় শ্রী শিবানন্দ সেনের অনুগত অষ্ট মহান্ত হিসাবে আবির্ভূত হন। এরা হলেন নিম্নরূপ।

ব্রজলীলায় চম্পক লতার অষ্টসখী	গৌড়লীলায় শিবানন্দের অনুগত অষ্ট মহান্ত
(i) কুরঙ্গাক্ষী ⇒	মকরধ্বজ দত্ত।
(ii) মণ্ডলী ⇒	মধু পণ্ডিত।
(iii) চন্দ্রিকা ⇒	পুরন্দর মিশ্র।
(iv) চন্দ্রলতিকা ⇒	গোবিন্দ ঠাকুর।
(v) কন্দুকাক্ষী ⇒	পরমানন্দ গুপ্ত।
(vi) সুমন্দিরা ⇒	বলরাম দাস।
(vii) সুচরিতা ⇒	রঘুনাথ দত্ত।
(viii) মণিকুণ্ডলা ⇒	বিষ্ণুদাস আচার্য।

(i) কুরুঙ্গাক্ষী ⇒ মকরধ্বজ দত্ত ব্রজলীলার কুরুঙ্গাক্ষী সখী গৌড়লীলায় মকরধ্বজ দত্ত নামে আবির্ভূত হন। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন।

(ii) মণ্ডলী ⇒ মধু পণ্ডিত শ্রী বৃন্দাবনবাসী ছিলেন। শ্রী পরমানন্দ গোস্বামী বৃন্দাবনের বংশীবট-এর নিকটে যে শ্রী শ্রী গোপীনাথ বিগ্রহ পান, ইনি তার প্রথম সেবক। মধু পণ্ডিত শ্রী গোপীনাথের বামে শ্রী রাধাবিগ্রহ সংস্থাপন করেছিলেন। শ্রী বীরভদ্র গোস্বামী (নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র) শ্রীবৃন্দাবন গমন করলে মধু পণ্ডিত অপরাপর ভক্তের সাথে তাঁকে আগ বাড়িয়ে নিতে এসেছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য শ্রীবৃন্দাবন থেকে প্রত্যাগমনের সময় মধু পণ্ডিতের নিকট বিদায় নিতে গেলে তিনি তাঁর গলায় শ্রী গোপীনাথের প্রসাদী মালা প্রদান করেন যাতে শ্রীনিবাসের যাত্রা নির্বিঘ্নে হয়।

(iii) চন্দ্রিকা ⇒ পুরন্দর মিশ্র ব্রজলীলার চন্দ্রিকা সখী গৌড়লীলায় পুরন্দর মিশ্র হিসাবে আবির্ভূত হন। তিনি শ্রী নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন।

(iv) চন্দ্র লতিকা ⇒ গোবিন্দ ঠাকুর গোবিন্দ ঠাকুর চৈতন্য শাখার অর্ন্তগত ছিলেন। এক সময় শ্রী ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ছিলেন। ঈশ্বরপুরী স্বধাম গমনের সময় তাকে মহাপ্রভুর সেবা করতে আজ্ঞা দিয়ে যান। গোবিন্দ নীলাচলে গমন করে

মহাপ্রভুকে ঈশ্বরপুরীর আজ্ঞা জানাইলে তিনি প্রথমে শ্রীগুরুর ভৃত্যকে নিজের সেবাকার্যে নিযুক্ত করতে রাজী হন নাই। পরে সার্বভৌম পণ্ডিতের বাক্যে গোবিন্দকে তাঁর সেবার অধিকার প্রদান করেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভোজনের পর প্রতিদিন গোবিন্দ পদসেবা দ্বারা প্রভুকে নিদ্রিত করার পর তবে নিজে ভোজন করতেন। তিনি মহাপ্রভুর গম্ভীরা লীলারও সঙ্গী ছিলেন।

(v) কন্দুকাক্ষী ⇒ পরমানন্দ গুপ্ত শ্রী পরমানন্দ গুপ্ত শ্রী নিত্যানন্দ শাখার অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। প্রভু এক সময় এর গৃহে অবস্থান করেছিলেন।

"পরমানন্দ গুপ্ত- কৃষ্ণভক্ত মহামতি।
পূর্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি॥"
(চৈ. চ. আদি ১১/৪৫)।

পরমানন্দ গুপ্ত **কৃষ্ণ স্তবাবলী** গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন।

(vi) সুমন্দিরা ⇒ বলরাম দাস (দ্বিজ বলরাম দাস ঠাকুর)

শ্রী নিত্যানন্দ শাখার অর্ন্তগত ছিলেন। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের অর্ন্তগত দোগাছিয়া গ্রামে বসবাস করতেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল।

"জয় প্রভু-প্রিয় শ্রী বলরাম দাস।
সঙ্গীত-প্রবীণ দোগাছিয়া যাঁর বাস॥
বলরাম দাস কৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদী
নিত্যানন্দ-নামে হয় পরম উন্মাদী॥"
(চৈ. চ. আদি ১১/৩৪-৩৫)।

শ্রী বলরাম ঠাকুর ভরদ্বাজ গোত্রীয় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাক্ষ্মণ ছিলেন। পিতার নাম সত্যভানু উপাধ্যায়। আদিনিবাস সিলেট জেলার পঞ্চখণ্ড গ্রামে। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে দীক্ষা গ্রহণের পর দোগাছিয়াতে এসে বসবাস করতে থাকেন।

এক সময় শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু কীর্ত্তন করতে করতে আগমন করে বলরামের শ্রী শ্রী গোপাল মূর্ত্তির সেবা দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে নিজের শিরোভূষণ (পাগড়ি) বলরামকে উপহার প্রদান করেন। বলরাম শ্রীগুরুর আজ্ঞায় বিবাহ করেছিলেন। নবদ্বীপের প্রভুপাদ শ্রী হরিদাস গোস্বামী তাঁর বংশধর ছিলেন।

প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীতে বলরামের তিরোভাব উপলক্ষে দোগাছিয়ায় বৈষ্ণব সমাগম হয়।

(vi) কমলা ⇒ শ্রীরাম পণ্ডিত (রামাই) বিখ্যাত শ্রীবাস পণ্ডিতের ভাই। তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কীর্ত্তন সঙ্গী ছিলেন। শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি–এই চার ভাই ছিলেন। সবাই সবংশে মহাপ্রভুর সেবা করতেন।

"চারিভাই সবংশে করে চৈতন্যের সেবা।
গৌড়চন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী সেবা॥"
(চৈ. চ. আদি ১০/১১)।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রকাশ সংবাদ জানানোর জন্য নবদ্বীপ থেকে শ্রীরাম পণ্ডিতকে শান্তিপুরে শ্রী অদ্বৈত সকাশে প্রেরণ করা হয়েছিল। (চৈ. ভাগবত মধ্য ৬/৯-৭১)। শ্রীরাম পণ্ডিত তার জৈষ্ঠ্য শ্রীবাস পণ্ডিতের আদেশে বিভিন্ন সময়ে মহাপ্রভুর সেবায় নিয়োজিত থাকতেন।

(vii) কামলতিকা ⇒ জগন্নাথ সেন জগন্নাথ সেন শ্রীগৌর পার্যদ ছিলেন। তার সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কিছু জানা যায় না।

(viii) কন্দর্প সুন্দরী ⇒ হিরণ্য পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য শাখার অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। এঁর গৃহে মহাপ্রভু বাল্যকালে একাদশীর দিন বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভক্ষন করেছিলেন।

"জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়।
যাঁরে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময়।
এই দুই ঘরে প্রভু একাদশী দিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইলা আপনে॥"
(চৈ. চ. আদি ১০/৭০-৭১)।

হিরণ্য পণ্ডিত রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন।

ছ. বক্রেশ্বর পণ্ডিতের অনুগত অষ্ট মহান্ত

ব্রজলীলার অষ্ট সখীর অন্যতম তুঙ্গবিদ্যার অনুগত অষ্ট সখীই শ্রী গৌড়লীলায় বক্রেশ্বর পণ্ডিতের অনুগত অষ্ট মহান্ত হিসাবে আবির্ভূত হন।

ব্রজলীলায় তুঙ্গবিদ্যার অনুগত অষ্ট সখী	গৌড়লীলায় বক্রেশ্বর পণ্ডিতের অনুগত অষ্ট মহান্ত
(i) মঞ্জুমেধা ⇒	মকরধ্বজ সেন।
(ii) সুমধুরা ⇒	বিদ্যা বাচস্পতি।

(iii) তনু মধ্যা ⇒	শ্রীকান্ত (সেন)।
(iv) গুণচূড়া ⇒	প্রবোধানন্দ সরস্বতী।
(v) বরাঙ্গদা ⇒	দ্বিজ রঘুনাথ।
(vi) মধুস্যান্দা ⇒	মাধব পণ্ডিত।
(vii) সুমধ্যা ⇒	ঠাকুর গোবিন্দ।
(viii) মধুরেক্ষণা ⇒	বলভদ্র ভট্টাচার্য।

(i) মঞ্জুমেধা ⇒ মকরধ্বজ সেন ব্রজলীলার মঞ্জুমেধা সখীই গৌড়লীলায় মকরধ্বজ সেন নামে আবির্ভূত হন। তার সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানা যায় না।

(ii) সুমধুরা ⇒ বিদ্যা বাচস্পতি মহেশ্বর (নরহরি) বিশারদের পুত্র এবং সুপ্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্বভৌমের ভাই-বিষ্ণুদাস। তিনি নবদ্বীপ থেকে উঠে কুমারহট্টে (বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হালিশহর নামক স্থান) বসবাস আরম্ভ করেন। মহাপ্রভু সর্বপ্রথম যখন পুরী থেকে গৌড়ে আসেন তখন এর গৃহে শুভাগমন করেছিলেন। তিনি **তত্ত্ব চিন্তামণি** নামক গ্রন্থের টীকাকার ছিলেন।

(iii) তনুমধ্যা ⇒ শ্রীকান্ত (সেন) শ্রীচৈতন্য শাখার অর্ন্তগত ছিলেন। তিনি শিবানন্দ সেনের ভাগিনেয়।

"শিবনানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন।
প্রভুর কৃপাতে তিঁহো মহাভাগ্যবান॥"
(চৈ. চ. অন্ত্য ২/৩৭)।

বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হালিশহর নামক স্থানে শ্রীকান্ত সেন আবির্ভূত হন। তিনি একবার পুরীধামে গিয়ে মহাপ্রভুর নিকট একনাগারে দুই মাস অবস্থান করেছিলেন। শ্রীকান্ত তার মামা শিবানন্দ সেনের সাথে পুরীতে রথযাত্রার সময় গমন করতেন।

(iv) গুণচূড়া ⇒ প্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রী গোপাল ভট্ট গোস্বামীপাদের কাকা। লক্ষ্মী নারায়ণের উপাসক ছিলেন। পরে শ্রী গৌরহরির কৃপায় শ্রী রাধাকৃষ্ণ রসে মত্ত হন। বেশ কিছু বৈষ্ণব গ্রন্থের লেখক ছিলেন।

(v) বরাঙ্গদা ⇒ দ্বিজ রঘুনাথ গৌরগণোদ্দেশ দিপীকা মতে ব্রজের বরাঙ্গদাই গৌড়লীলায় দ্বিজ রঘুনাথ হিসাবে আবির্ভূত হন। তিনি শ্রীগৌর ভক্ত ছিলেন।

(vi) মধূস্যান্দা ⇒ মাধব পণ্ডিত ব্রজের মধুস্যান্দা সখীই গৌড়লীলায় মাধব পণ্ডিত হিসাবে আবির্ভূত হন। তিনি শ্রী অদ্বৈত প্রভুর শাখার অর্ন্তগত ছিলেন।

(vii) সুমধ্যা ⇒ ঠাকুর গোবিন্দ (গতি গোবিন্দ ঠাকুর) শ্রীনিবাস আচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র ও শিষ্য। যাজি গ্রামে নিবাস ছিল। ঠাকুর গোবিন্দ মহাপ্রভুর অতিশয় ভক্ত ছিলেন।

"গোবিন্দ গতি নাম কনিষ্ঠ তনয়।
তাঁরে কৃপা কৈল প্রভুর সদয়-হৃদয়॥"
(কর্ণামৃত ⇒ কবি কর্ণপুর)।

(viii) মধূরেক্ষণা ⇒ বলভদ্র ভট্টাচার্য গৌরগণোদ্দেশ দিপীকা গ্রন্থ অনুযায়ী বলভদ্র ভট্টচার্য ব্রজের মধুরেক্ষণা সখী ছিলেন। শ্রীচৈতন্য শাখার অর্ন্তভুক্ত ছিলেন।

"বলভদ্র-ভট্টাচার্য ভক্তি অধিকারী।
মথুরা গমনে প্রভুর যেঁহো অধিকারী॥"
(চৈ. চ. আদি ১০/১৪৬)।

মহাপ্রভু নীলাচল থেকে বন পথে গমন করার সিদ্ধান্ত নিলে রামানন্দ রায় এবং স্বরূপ দামোদর বলভদ্রকে এবং তাঁর একজন ব্রাক্ষণ ভৃত্যকে প্রভুর সাথে প্রেরণ করেছিলেন।

"স্বরূপ কহে–এই বলভদ্র ভট্টাচার্য।
তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড়, পণ্ডিত, সাধু আর্য॥"
(চৈ. চ. মধ্য ১৭/১৫)।

বলভদ্র গৌড়দেশবাসী ব্রাক্ষণ ছিলেন এবং প্রথমে প্রভুর সাথে পুরীতে গমন করেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবনে অবস্থানকালে একদিন ভাবের আবেগে যমুনাতে ঝাপ দিলে বলভদ্র অপরাপর ভক্তদের সাহায্যে তাঁকে বহুকষ্টে উত্তোলন করেন। শ্রী বৃন্দাবন দর্শনে প্রভুর ভাবের আধিক্য দেখে বলভদ্র চিন্তিত হন। তিনি প্রভুকে অনেক বুঝিয়ে বৃন্দাবন থেকে বের করেন এবং প্রয়াগধামে যাত্রা করেন।

মহাপ্রভু বৃন্দাবন থেকে পুরীতে আগমন করলে কিছুদিন পর সনাতন গোস্বামী পুরীতে আগমন করেন। তিঁনি বলভদ্রের নিকট থেকে প্রভুর বনপথে বৃন্দাবন যাত্রার বিবরণসমূহ লিখে নিয়েছিলেন।

জ. বাসুদেব ঘোষের অনুগত অষ্ট মহান্ত

ব্রজলীলার অষ্ট সখীর অন্যতম প্রধান সুদেবীর অনুগত অষ্ট সখীই গৌড়লীলায় শ্রী বাসুদেব ঘোষের অনুগত অষ্ট মহান্ত হিসাবে আবির্ভূত হন।

ব্রজলীলায় সুদেবীর অনুগত অষ্ট সখী	গৌড়লীলায় শ্রী গোবিন্দ ঘোষের অনুগত অষ্ট মহান্ত
(i) কাবেরী ⇒	রাঘব পণ্ডিত।
(ii) সুকেশী ⇒	মকরধ্বজ পণ্ডিত।
(iii) মঞ্জুকেশিকা ⇒	কংসারী সেন।
(iv) হারহীরা ⇒	শ্রীজীব পণ্ডিত।
(v) মহাহীরা ⇒	মুকুন্দ কবিরাজ।
(vi) হারকণ্ঠী ⇒	ছোট হরিদাস।
(vii) চারুকবরা ⇒	মুরারী চৈতন্য দাস।
(viii) মনোহরা ⇒	চন্দ্রশেখর কবি।

(i) কাবেরী ⇒ রাঘব পণ্ডিত শ্রীচেতন্য শাখার অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পানিহাটী গ্রামে বসবাস করতেন। রাঘব পণ্ডিত মহাপ্রভুর প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করে রাখতেন। এজন্য তাকে প্রভুর খাদ্য অনুচর বলা হতো (চৈ.চ. আদি ১০/২৪)।

পানিহাটী গ্রামে রাঘব-দয়মন্তী ধাম।
রাঘবের ঝালি বলি আছয়ে আখ্যান॥”
(পাট পর্যটন)।

এই রাঘবের ঝালি সাজাতেন তার ভগ্নী দয়মন্তী। এতে মহাপ্রভুর বার মাসের খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষিত হতো (ঐ ১০/২৫-২৭)। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় ভাই-বোন খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করে মহাপ্রভুকে নিবেদন করতেন।

(ii) সুকেশী ⇒ মকরধ্বজ পণ্ডিত গৌরগণোদ্দেশ দিপীকা গ্রন্থ মতে তিনি পূর্বলীলায় সুকেশী সখী ছিলেন। তিনি মুরারী পণ্ডিতের পুত্র ছিলেন। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয়পাত্র ছিলেন।

(iii) মঞ্জুকেশিকা ⇒ কংসারী সেন শ্রী নিত্যানন্দ শাখার অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। জাতিতে বৈদ্য। ইনি প্রসিদ্ধ সদাশিব কবিরাজের পিতা ছিলেন। কংসারী সেন শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর আপনজন ছিলেন।

(iv) হারহীরা ⇒ শ্রীজীব পণ্ডিত রত্নগর্ভাচার্যের পুত্র ছিলেন। শ্রী গৌর ভক্ত ছিলেন।

(v) মহাহীরা ⇒ মুকুন্দ কবিরাজ শ্রী নিত্যানন্দ শাখার অর্ন্তগত ছিলেন। মুকুন্দ কবিরাজরা তিন ভাই ছিলেন– গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ ও মুকুন্দ (চৈ. চ. আদি ১১/৫১)। সবাই শ্রীগৌর–নিত্যানন্দের পরম ভক্ত ছিলেন।

(vi) হারকণ্ঠী ⇒ ছোট হরিদাস শ্রীচৈতন্য শাখার অর্ন্তগত ছিলেন। তিনি প্রধানত একজন কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। ছোট হরিদাস নামে প্রভুর কীর্ত্তনীয়া–এভাবে তার পরিচয় রয়েছে (চৈ. চ. অন্ত্য ২/১০২)। তিনি মহাপ্রভুকে কীর্ত্তন শুনাতেন। তার কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল। একবার পুরীধামে ভগবান আচার্য নামক একজন ভক্ত মহাপ্রভুকে নিজের গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু তার গৃহে উত্তম চাল না থাকায় তিনি হরিদাসকে দিয়ে শিখি মাহিতির বোন মাধবী দাসীর গৃহ থেকে উত্তম চাল এনে অন্ন তৈরি করে মহাপ্রভুকে ভোজন করান। মাধবীকে সম্ভাষণ ও চাল আনার বিষয়টি জানতে পেরে মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে ত্যাগ করেন। অপরাপর ভক্তবৃন্দের অনুরোধেও মহাপ্রভু তাকে পুনরায় তার ভৃত্য হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। এই দুঃখে এক বছর পর ছোট হরিদাস কাউকে কিছু না বলে মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বার বার দণ্ডবৎ প্রণাম করে প্রয়াগধামে চলে যান। সেখানে তিনি ত্রিবেণীসঙ্গমে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন।

"প্রভুপদ-প্রাপ্তি লাগি সঙ্কল্প করিল।
ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল॥"
(চৈ. চ. অন্ত্য ২/১৪৭)।

বেশ কিছুদিন পর গৌড়ীয় ভক্তগণ ছোট হরিদাসের দেহ ত্যাগের বিষয়টি জানতে পারেন। শ্রীবাস পণ্ডিত প্রয়াগধামে ছোট হরিদাসের দেহ ত্যাগের কথা জানাইলে প্রভু বলেছিলেন যে প্রকৃতি দর্শন (স্ত্রীলোক দর্শন) ও সম্ভাষণ করলে এরূপ প্রায়শ্চিত্ত হয় (চৈ. চ. **অন্ত্য ২/১৬৫**)।

জীবের শিক্ষার জন্য মহাপ্রভু হরিদাসকে বর্জন করলেও নিজের ভক্তকে ত্যাগ করেন নাই, ত্যাগ করতে পারেন না। হরিদাস ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করা মাত্রই ⇒

"সেইক্ষণে প্রভু স্থানে দিব্যদেহে আইলা।
প্রভু কৃপা পাইয়া অন্তধ্যানেতে রহিলা।
গন্ধর্ব-দেহে গান করেন অর্ন্তধানে।
রাত্রে প্রভুরে গীত শোনায়, অন্যে নাহি জানে॥"

(চৈ. চ. অন্ত্য ২/১৪৮-১৪৯)।

মোটকথা হরিদাসকে বর্জন করে আসলে মহাপ্রভু অপরাপর ভক্তগণকে নারী সম্ভাষণ যে মহা অপরাধ তা বোঝাতে চেয়েছিলেন।

"দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
সপ্নেহ ছাড়িল সবে স্ত্রী সম্ভাষণে॥"

(চৈ. চ. অন্ত্য ২/১৪৪)।

(vii) চারুকবরা ⇒ মুরারী চৈতন্য দাস (মুরারী পণ্ডিত)

শ্রী নিত্যানন্দ শাখার অর্ন্তগত ছিলেন। মুরারী চৈতন্য দাসের অনেক লীলা রয়েছে।

"মুরারি চৈতন্য দাসের অলৌকিক লীলা।
ব্যাঘ্র গালে চড় মারে, সর্পসনে খেলা॥"

(চৈ. চ. আদি ১১/২০)।

চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের অন্ত্য লীলার পঞ্চম অধ্যায়ের ৪২৬-৪৩৫ পয়ার পর্যন্ত এঁর লীলা সবিস্তারে বর্ণিত রয়েছে।

(viii) মনোহরা ⇒ চন্দ্রশেখর কবি সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তা। পিতার নাম-শ্রী গোবিন্দানন্দ ঠাকুর। বীরভূম জেলার কাঁদরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। **চন্দ্রশেখর সুকবি এবং সুগায়ক ছিলেন।**